তাওহীদের ডাক

মার্চ-এপ্রিল ২০১৬

- নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের মূলনীতি
- আদর্শ সমাজ গঠনে লুক্বমান হাকীমের উপদেশ
- কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে ঈমানের শাখা
- বিশ্ব ভালবাসা দিবস : প্রগতির আড়ালে অশ্লীলতার বিজ্ঞাপন

সাতক্ষীরা যেলার কিছু মাযার ও খানকা

Contents

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

২৬ তম সংখ্যা
মার্চ-এপ্রিল ২০১৬

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
মুযাফফর বিন মুহসিন
নূরুল ইসলাম
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহিল কাফী

সহকারী সম্পাদক
বযলুর রহমান

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
সহকারী সম্পাদক : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৪৪-৫৭৬৫৮৯ (বিকাশ)
ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com
ওয়েব : www. tawheederdak.at-tahreek.com

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ২
- কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা ৩
- তাবলীগ ৫
  নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের মূলনীতি (২য় কিস্তি)
  অনুবাদ : আবু সাঈদ
- তারবিয়াত ৭
  আদর্শ সমাজ গঠনে লুক্বমান হাকীমের উপদেশ (২য় কিস্তি)
  বযলুর রহমান
- ধর্ম ও সমাজ ১৩
  কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে ঈমানের শাখা (৩য় কিস্তি)
  হাফেয আব্দুল মতীন
- চিন্তাধারা ১৬
  বিশ্ব ভালবাসা দিবস : প্রগতির আড়ালে অশ্লীলতার বিজ্ঞাপন
  লিলবর আল-বারাদী
- সরেযমীন প্রতিবেদন ২০
  সাতক্ষীরা যেলার কিছু মাযার ও খানকা *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)*
  তাওহীদের ডাক ডেস্ক
- আহলেহাদীছ আন্দোলন ২৫
  দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন
  মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- পূর্বসূরীদের লেখনী থেকে ২৭
  আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূলনীতি
  আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী
- প্রবন্ধ ২৯
  জাতিসংঘ মানবাধিকার ও ইসলাম... প্রসঙ্গ বহুবিবাহ
  শামসুল আলম
- সংগ্রামী জীবন ৩৪
  ইমাম বাগাভী (রহঃ)
  আব্দুল্লাহ
- ফলোআপ ৩৬
  শিশু-কিশোরদের উপর নৃশংস নির্যাতন... তার প্রতিকার
  মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
- শিক্ষা ও সাহিত্য ৩৯
  ইসলামী পাঠদানের পদ্ধতি
  আব্দুল্লাহ খোরশেদ
- আলোকপাত ৪৪
  তাওহীদের ডাক ডেস্ক
- পরশ পাথর ৪৮
  পবিত্র কুরআন শ্রবণ করে মুসলিম হলেন বিমানের পাইলট
  তাওহীদের ডাক ডেস্ক
- ভ্রমণস্মৃতি ৪৯
  স্বরণদ্বীবের স্মরণকথা
  আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
- সংগঠন সংবাদ ৫৪
- সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম) ৫৬

সম্পাদকীয়

হে তরুণ! সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে জাগ্রত হও

সত্য ও মিথ্যার সংঘাত চিরন্তন। ন্যায়ের অনুসারীরা চিরদিন প্রশংসিত ও সম্মানিত। কেননা তারা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রাম করেন। হাযারো বিপদ-আপদ, দুঃখ-যন্ত্রণা, যুলুম-অত্যাচার ও নিপীড়নের মধ্যেও তারা সত্য থেকে পিছপা হন না। সত্য প্রতিষ্ঠায় তারা থাকেন চিরদিন আপোষহীন। বাতিলপন্থীদের উপর্যুপরী মিথ্যা অপবাদ, ষড়যন্ত্র-সংঘাত, গীবত-তোহমত, ও হিংসাত্মক আক্রমণে হক্বপন্থীগণ থাকেন সর্বদা পাহাড়সম ধৈর্যশীল। আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা রেখে আল্লাহ প্রদত্ত চিরন্তন সত্যের পথে অবিচল থাকেন চিরস্থায়ী বাসস্থান জান্নাত লাভের প্রত্যাশায়। তাই পৃথিবীর সমস্ত বাতিল শক্তি একত্রিত হ'লেও অবশেষে তারাই হন বিজয়ী। পক্ষান্তরে অপরাধীরা চিরদিন লাঞ্ছিত ও অপমানিত। তারা অন্যায় ও ত্বাগূতের পক্ষে সংগ্রাম করে। হক্বপন্থীগণের গ্রহণযোগ্যতা, সম্মান-মর্যাদা, সহজ-সরলতা, নমনীয়তা এবং নম্র আচরণকে নষ্ট করতে দিশেহারা হয়ে যায়। হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। ন্যায়-অন্যায় বিচার করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ফলে অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হয়ে আফসোসের চোরাবালিতে পতিত হয়। এসময় তাদের অভিভাবক হয় ইবলীস শয়তান। অলক্ষ্যে থেকে ইবলীস তাদেরকে প্রলোভন দেখিয়ে হক্বপন্থীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। দুনিয়ার এই অস্থায়ী ক্ষমতা ও অহংকারে বুঁদ হয়ে তারা নিজেদেরকে সকল ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। নিজেদের চিন্তা-চেতনাকে সত্যের মাপকাঠি হিসাবে মনে করে থাকে। ফলে তারা নমরূদ, ফেরআউন, আবু জাহাল, আবু লাহাবের মত পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নিক্ষিপ্ত হয় ইতিহাসের নোংরা আস্তাকুঁড়ে।

হে তরুণ! মতবাদ বিক্ষুব্ধ অশান্ত এ পৃথিবী আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। অনৈতিকতার তাণ্ডব নৃত্য, পারস্পরিক হিংসা-প্রতিহিংসার প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, ক্ষমতার দম্ভ, বিভক্তির শয়তানি প্ররোচনা, দখলদারিত্বের উন্মাদনা, বর্বর মানসিকতা, মিথ্যাচারের আস্ফালন, সংকীর্ণতার মায়াজাল, সূদ-ঘুষ ও প্রতারণাপূর্ণ পুঁজিবাদী অর্থনীতির আক্রমণ, মস্তিষ্ক প্রসূত রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদের হিংস্রতা, বৈষয়িকতার নামে ধর্মহীনতা, ধর্মীয় বাড়াবাড়ি, মাযহাব কেন্দ্রীক দলাদলী, জঙ্গীবাদের ভয়ঙ্কর উত্থান, দুর্নীতি-চাঁদাবাজীর বন্যতা, অশ্লীল ও বেহায়াপনার বিস্তৃতি ও সন্ত্রাসী তৎপরতায় সমগ্র বিশ্ব আজ অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। প্রতিনিয়ত যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুকূপের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে অসহায় মানবতা। প্রশ্ন হ'ল, এখান থেকে কি কোন মুক্তি নেই, বাঁচার কোন ক্ষীণ আশারও প্রদীপ জ্বালাতে পারবে কি কেউ?

হে চির অজেয় তরুণ সমাজ! বিশ্ব আজ অবাক নেত্রে তাকিয়ে রয়েছে তারুণ্যদীপ্ত উজ্জ্বল তারকা সদৃশ একঝাঁক যুবকের প্রতি। যারা হবে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অন্যায় থেকে মুক্ত, চির শাশ্বত ইসলামী আদর্শের সত্যনিষ্ঠ অনুসারী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন, সকল প্রভঞ্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ধর্মীয় ও বৈষয়িক জ্ঞানে পরিপক্ক, নৈতিকতার ময়দানে অবিচল সৈনিক, সত্য ও ন্যায়ের অতন্দ্রপ্রহরী, জাতীয় ও বিজাতীয় মতবাদসমূহের মূলোৎপাটনকারী, সূদ-ঘুষ ও প্রতারণাপূর্ণ অর্থনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী, ইহূদী-খ্রীষ্টান ও সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর চালু করা নানাবিধ অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ। যাদের ব্যাঘ্র হুংকারে বাতিলপন্থীদের হৃদয় প্রকম্পিত হবে, নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে দাম্ভিকতার দুর্বল প্রাচীর, চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে অহঙ্কারীর আস্ফালন। অতএব হে যুবক! ক্লান্তিহীন চেতনায় অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চল মহা সত্যের সন্ধানে।

হে হক্বপন্থী তরুণ ছাত্রসমাজ! হক্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তোমাকেই সম্মুখে অগ্রসর হ'তে হবে। মিথ্যাকে নস্যাৎ করে হক্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তোমাকেই সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হবে। ঐ শোন মহান আল্লাহ্র দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও' *(তওবা ৯/১১৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সত্য পুণ্যের পথ দেখায় এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়... এবং মিথ্যা পাপের পথ দেখায় এবং পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়...' *(মুত্তাফাক্ব আলাহই, মিশকাত হা/৪৮২৪)*। তিনি আরো বলেন, 'সত্য প্রশান্তির কারণ এবং মিথ্যা সন্দেহের কারণ' *(তিরমিযী হা/২৫১৮; মিশকাত হা/২৭৭৩, সনদ ছহীহ)*। অতএব হে যুবক! তোমার কিসের এত শঙ্কা! তোমার যৌবনের তেজদীপ্ত খুন কি বাতিল শক্তিকে পর্যদুস্ত করার জন্য ব্যয়িত হবে না? জান্নাত পাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় কি তোমার বক্ষ প্রসারিত হবে না? হৃদয়ের প্রগাঢ় বিশ্বাস কি তাহলে এভাবেই ধুলিসাৎ হয়ে যাবে? তুমি কি লক্ষ্য করনি, তোমার পূর্বসূরীরা হক্বকে বিজয়ী করার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন, যাদের তপ্ত লহু যমীনকে করেছে রক্তাক্ত, জ্বলন্ত অঙ্গারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, শি'আবে আবু ত্বালেবে সাড়ে তিন বছর নির্বাসিত জীবন-যাপন করেছেন, ফাঁসির মঞ্চে হাসিমুখে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, জ্বলন্ত আগুনে উত্তপ্ত লোহার উপরে চিৎ করে শুইয়ে রেখে বুকের উপর ভারী পাথর চাপা দিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে, ফলে পিঠের চামড়া ও গোশত গলে লোহার আগুন নিভে গিয়েছিল, প্রচণ্ড দাবদাহে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুরাশিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উপুড় হয়ে শুয়ে থেকে শাস্তি ভোগ করেছেন, দু'পা রশি দিয়ে বেঁধে ঘোড়ার লাগামের সাথে লাগিয়ে দু'দিকে ঘোড়া হাঁকিয়ে শরীরকে দ্বি-খণ্ডিত করে হত্যা করা হয়েছে, জ্বলন্ত আগুনে লোহা উত্তপ্ত করে গুপ্তাঙ্গের ভিতর ঢুকিয়ে হত্যা করা হয়েছে। শুধু তাই-ই না, শাহ ইসমাঈল শহীদকে হত্যা করেও বিরোধীপক্ষ ক্ষ্যান্ত হয়নি। তার লাশ টুকরা টুকরা করে কেটে সমুদ্রের পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছে। এভাবে অসংখ্য মানুষ নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তবুও তারা কেউ হক্ব থেকে বিচ্যুত হয়নি। স্তিমিত হয়নি হক্ব আন্দোলনের গতিধারা। তাহলে তুমি কেন ভয়ে লুকিয়ে রয়েছ? সত্য ও ন্যায়ের শেষ ঠিকানা তো জান্নাত! অতএব হে তরুণ! প্রস্তুতি গ্রহণ কর, হক্ব ও ন্যায়ের পক্ষে জাগ্রত হও। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন-আমীন!!

মতবিরোধ করা

আল-কুরআনুল কারীম :

১- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

(১) ‘ হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যে আমীরের; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ হ’লে তা সমার্পণ কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট। ইহাই উত্তম এবং পরিণামে সর্বোৎকৃষ্ট’ *(নিসা ৪/৫৯)*।

২- إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

(২) ‘স্মরণ করুন, আল্লাহ আপনাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে, তারা সংখ্যায় অল্প; যদি তোমাকে দেখাতেন যে, তারা সংখ্যায় অধিক তবে তোমরা সাহস হারাতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলেন এবং অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে অবহিত’ *(আনফাল ৮/৪৩)*।

৩- وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا.

(৩) ‘এভাবে আমি মানুষকে ওদের বিষয় জানিয়ে দিলাম, যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং ক্বিয়ামতের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করেছিল তখন অনেকে বলল, ওদের উপর সৌধ নির্মাণ কর। ওদের প্রতিপালক ওদের বিষয় ভাল জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হ’ল তারা বলল, আমরা তো নিশ্চয় ওদের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করব’ *(কাহাফ ১৮/২১)*।

٤- لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ.

(৪) ‘আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি ইবাদত পদ্ধতি, যা তারা অনুসরণ করে। সুতরাং তারা যেন আপনার সাথে এই ব্যাপারে বিতর্ক না করে। আপনি তাদেরকে আপনার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করুন, আপনি তো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত’ *(হজ্জ ২২/৬৭)*।

٥- إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

(৫) ‘নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহ্র নিকট একমাত্র দ্বীন। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা পরস্পর বিদ্বেষবশত তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর মতানৈক্য করেছিল। আর কেউ আল্লাহ্র নিদর্শনকে অস্বীকার করলে আল্লাহ তো হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর’ *(আলে ইমরান ৩/১৯)*।

٦- إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.

(৬) ‘স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! আমি তোমার সময় পূর্ণ করছি ও আমার নিকট তোমাকে তুলে নিচ্ছি এবং যারা কুফরী করেছে তাদের মধ্য হ’ত তোমাকে পবিত্র করছি। আর তোমার অনুসারীগণকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিয়েছি, অতঃপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটেছে আমি তা মীমাংসা করে দিব’ *(আলে ইমরান ৩/৫৫)*।

٧- وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.

(৭) ‘মানুষ ছিল একই উম্মত, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে। তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে তারা যে বিষয়ে মতভেদ ঘটায় তার মীমাংসা তো হয়ে যেত’ *(ইউনুস ১০/১৯)*।

হাদীছে নববী :

٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَجَعُهُ قَالَ ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ. قَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللَّغَطُ قَالَ قُومُوا عَنِّى وَلاَ يَنْبَغِى عِنْدِى التَّنَازُعُ فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ كِتَابِهِ.

(৮) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ)-এর অসুখ যখন বৃদ্ধি পেল তখন তিনি বললেন, আমার নিকট লেখার জিনিস নিয়ে এস, আমি তোমাদের এমন কিছু লিখে দিব যাতে পরে তোমরা আর পথভ্রষ্ট হবে না। ওমর (রাঃ) বললেন, নবী (ছাঃ)-এর রোগ-যন্ত্রণা প্রবল হয়ে গেছে (এমতাবস্থায় কিছু বলতে বা লিখতে তাঁর কষ্ট হবে)। আর আমাদের নিকট তো আল্লাহ্‌র কিতাব আছে, যা আমাদের জন্য যথেষ্ট। এতে ছাহাবীগণের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল এবং শোরগোল বেড়ে গেল। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও। আমার নিকট ঝগড়া-বিবাদ করা অনুচিত। এ পর্যন্ত বর্ণনা করে ইবনু আব্বাস (রাঃ) এ কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন যে, হায় বিপদ সাংঘাতিক বিপদ! আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) এবং তাঁর লেখনীর মধ্যে যা বাধ সেধেছে *(বুখারী হা/১১৪)*।

৯- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ... فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.

(৯) উবাদাহ ইবনু ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, ... তিনি বলেন, আমাদের থেকে রাসূল (ছাঃ) যে ওয়াদা গ্রহণ করেছিলেন তাতে ছিল যে, আমরা আমাদের সুখে-দুঃখে, বেদনায়-আনন্দে এবং আমাদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিলেও পূর্ণরূপে শ্রবণ ও আনুগত্য করার উপর বায়'আত করলাম। আরও বায়'আত করলাম যে, আমরা ক্ষমতা সম্পর্কিত বিষয়ে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে ঝগড়া করব না। কিন্তু যদি স্পষ্ট কুফরী দেখ তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র তরফ থেকে যে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান, তাহ'লে আলাদা কথা *(বুখারী হা/৭০৫৫-৭০৫৬)*।

১০- سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِى هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِدَّتُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَدْ حَلَّتْ. فَجَعَلاَ يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِى يَعْنِى أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.

(১০) সুলায়মান ইবনু ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আবু সালামা ইবনু আব্দুর রহমান (রাঃ) ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নিকট সমবেত হ'লেন। তারা এমন একজন মহিলার কথা আলোচনা করছিলেন যিনি তার স্বামীর ইনতিকালের কয়েক দিন পরেই সন্তান প্রসব করেছেন। তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, তার ইদ্দত হবে দু'টির মধ্যে দীর্ঘতরটি। আবু সালামা (রাঃ) বললেন, তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে। বিষয়টি নিয়ে তারা দু'জনে বিতর্ক শুরু করে দিলেন। বর্ণণাকারী বলেন, তখন আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, আমি আমার ভাতিজা আবু সালামার পক্ষে। এরপর তারা সবাই ইবনু আব্বাসের মুক্তদাস কুরায়বাকে উম্মু সালামা (রাঃ)-এর কাছে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য পাঠালেন। সে তাদের নিকট এসে বলল, উম্মু সালামা (রাঃ) বলেছেন, সুবাই'আহ আসলামিয়া তার স্বামীর মৃত্যুর কয়েক রাত পরেই সন্তান প্রসব করেন এবং তিনি সে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হাজির করেন। তখন তিনি তাকে বিবাহ করার অনুমতি দেন *(মুসলিম হা/৩৭৯৬)*।

১১- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِى قُرَيْشٍ لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ.

(১১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যতদিন তারা দ্বীন কায়েমে লেগে থাকবে ততদিন খিলাফত ও শাসন ক্ষমতা কুরাইশদের হাতেই থাকবে। এ বিষয়ে যে-ই তাদের সাথে শত্রুতা করবে আল্লাহ তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করবেন *(বুখারী হা/৩৫০০)*।

১২- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِى وَالْعَظَمَةُ إِزَارِى فَمَنْ نَازَعَنِى وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِى النَّارِ.

(১২) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, অহংকার আমার চাদর, বড়ত্ব আমার লুঙ্গী। যে ব্যক্তি এই দু'য়ের মধ্যে কোনটা গ্রহণ করবে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব *(আবুদাঊদ হা/৪০৯০, সনদ ছহীহ)*।

মনীষীদের বক্তব্য :

১. মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র বাণী 'তোমরা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করবে না, অন্যথায় সাহস হারিয়ে ফেলবে' *(আনফাল ৮/৪৬)*-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা মতপার্থক্য কর না, অন্যথায় তোমরা ভীরু হয়ে যাবে এবং সাহায্য হারিয়ে ফেলবে *(আল-মারজাউস সাবেক ২/৩১৮ পৃঃ)*।

২. মুজাহিদ (রহঃ) আরো বলেন, আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমাদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য হয়, তাহ'লে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে সমার্পণ কর' *(নিসা ৪/৫৯)*- এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'আলেমগণের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে মতবিরোধ হয়, তাহ'লে তা আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের দিকে সমার্পণ করা' *(আল-মারজাউস সাবেক ৩/৩৪৩ পৃঃ)*।

সারবস্তু :

১. মতবিরোধ ব্যর্থতার দিকে ধাপিত করে, ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে দুর্বল করে এবং প্রশান্তি ও বিজয়কে ছিনিয়ে নেয়।

২. মতপার্থক্য মানুষের মাঝে ঘৃণা ও বিদ্বেষের জন্ম দেয়।

৩. মতবিরোধ দুনিয়ায় ক্ষতি এবং পরকালে শাস্তির কারণ।

৪. মতপার্থক্য ঐক্যবদ্ধ জামা'আতকে দুর্বল করে এবং শত্রুপক্ষের শক্তিকে বৃদ্ধি করে।

৫. মতবিরোধ সামাজিক শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে এবং চরম বিভক্তির দিকে ধাপিত করে।

নবী ও রাসূলগণের দাওয়াতের মূলনীতি

-অনুবাদ : আবু সাঈদ

(২য় কিস্তি)

মূলনীতি-৭ : বিরুদ্ধাচরণকারী কাফেরদের সামনে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অবিচলতা প্রকাশ করা।

(ক) আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَالُوْا يَا هُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ-إِنْ نَقُوْلُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوْءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوْا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُوْنَ- مِنْ دُوْنِهِ فَكِيْدُوْنِي جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ- إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ. 'তারা বলল, হে হূদ! তুমি তো আমাদের সামনে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করনি এবং আমরা তোমার কথায় আমাদের উপাস্য দেবতাদেরকে বর্জন করতে পারি না, আর আমরা কিছুতেই তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী নই'। 'আমাদের কথা এই যে, আমদের উপাস্য দেবতাদের মধ্য হ'তে কেউ তোমাকে দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে। তিনি (হূদ) বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেক যে, তোমরা যে ইবাদতে শরীক করেছ তা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত। সুতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাক। অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশ দিও না'। 'আমি আল্লাহ্র উপর ভরসা করছি, যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী রয়েছে সবাই তার মুষ্টিতে আবদ্ধ। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরল পথে রয়েছেন' *(হূদ ১১/৫৩-৫৬)*।

(খ) মহান আল্লাহ আরো বলেন, قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ- قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ 'আপনি বলুন, নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক আমাকে সঠিক ও নির্ভুল পথে পরিচালিত করেছেন। ওটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন এবং ইবরাহীমের অবলম্বিত আদর্শ, যা ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেছিলেন। আর সে মুশরিদের অন্তর্গত ছিল না'। 'আপনি বলে দিন, আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সব কিছুই সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য'। 'তার কোন শরীক নেই, আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি। আর মুসলিমদের মধ্যে আমিই হলাম প্রথম' *(আন'আম ৬/১৬১-১৬৩)*।

(গ) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوْا بِاللَّهِ 'তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা এক আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শুরু হ'ল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য যদি না তোমরা এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আন' *(মুমতাহিনা ৬০/৪)*।

(ঘ) আল্লাহ তা'আলা ফেরআউনের জাদুকরদের সম্পর্কে বলেন,

قَالُوْا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا- إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى.

'যখন তারা ঈমান আনল। তারা বলল, আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নির্দশন এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার উপর তোমাকে কিছুতেই আমরা প্রাধান্য দিব না। সুতরাং তুমি কর যা তুমি করতে চাও, তুমিতো শুধু এই পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার'। আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদেরকে জাদু করতে বাধ্য করেছ। আর আল্লাহই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী' *(ত্বহা ২০/৭২-৭৩)*।

মূলনীতি-৮ : হঠকারী কাফের ও মুনাফিকদের উপর কঠোরতা অবলম্বন করা :

(এক) আল্লাহ তা'আলা বলেন, مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ 'মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল' *(ফাত্হ ৪৮/২৯)*।

(দুই) অন্যত্র মহান আল্লাহ নবী করীম (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ 'হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের বাসস্থান হচ্ছে জাহান্নাম এবং ওটা নিকৃষ্ট স্থান' *(তওবাহ ৯/৭৩)*।

(তিন) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ 'হে মুমিনগণ! ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের আশেপাশে অবস্থান করছে, যাতে করে

তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা খুঁজে পায়। জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথেই রয়েছেন’ *(তওবাহ ৯/১২৩)*।

মূলনীতি-৯ : ভীতি ও বিপদ অবস্থায় কাফেরদের সাথে কোমল আচরণ করা :

(১) আল্লাহ বলেন, لَا يَتَّخذ الْمُؤْمنُوْنَ الْكَافريْنَ أَوْلَيَاءَ منْ دُون الْمُؤْمنيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلكَ فَلَيْسَ منَ اللّٰه في شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوْا منْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّٰه الْمَصيْرُ ‘মুমিনগর্ণ যেন মুমিনগণ ব্যতীত কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে এবং তাদের আশঙ্কা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে সে আল্লাহ্র নিকট সম্পর্কহীন। আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করেছেন এবং আল্লাহ্র দিকে ফিরে যেতে হবে’ *(আলে ইমরান ৩/২৮)*।

(২) মহান আল্লাহ আরো বলেন, مَنْ كَفَرَ باللّٰه منْ بَعْد إِيْمَانه إِلَّا مَنْ أُكْرهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌّ بالْإِيْمَان وَلَكنْ مَنْ شَرَحَ بالْكُفْر صَدْرًا فَعَلَيْهمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰه وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيْمٌ ‘কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহ্র গযব এবং তার জন্য আছে মহাশাস্তি। তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয়। কিন্তু তার হৃদয় ঈমানে অবিচল’ *(নাহল ১৬/১০৬)*।

মূলনীতি-১০ : আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেওয়া ও এমন পথের দিকে দাওয়াত দেওয়া, যা আল্লাহ্র নিকটে পৌঁছেছে। আর দাওয়াত প্রাপ্তদের উচিত দাওয়াত গ্রহণ করা :

(এক) আল্লাহ তা‘আলা বলেন, قُلْ هَذه سَبيْلِيْ أَدْعُوْ إِلَى اللّٰه عَلَى بَصيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحَانَ اللّٰه وَمَا أَنَا منَ الْمُشْركيْنَ ‘বলুন, ইহাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই’ *(ইউসুফ ১২/১০৮)*।

(দুই) অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ادْعُ إِلَى سَبيْل رَبِّكَ بالْحكْمَة وَالْمَوْعظَة الْحَسَنَة وَجَادلْهُمْ بالَّتي هيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيْله وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمُهْتَديْنَ ‘আপনি মানুষকে আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা করুন সুন্দরভাবে। আপনার প্রতিপালক ভাল করেই জানেন কে তার পথ ছেড়ে বিপথগামী এবং কে সৎপথে আছে’ *(নাহল ১৬/১২৫)*।

(তিন) মহান আল্লাহ বলেন, وَكَذَلكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبيًّا لتُنْذرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذرَ يَوْمَ الْجَمْع لَا رَيْبَ فيه فَريْقٌ في الْجَنَّة وَفَريْقٌ في السَّعيْر ‘এভাবে আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায়, যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন মক্কা এবং তার চতুর্দিকের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পারেন ক্বিয়ামতের দিন সম্পর্কে। যাতে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং অন্যদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে’ *(শূরা ৪২/৭)*।

মূলনীতি-১১ : মানুষকে তাদের স্বভাষায় দাওয়াত দেওয়া কিংবা তাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তিকে দায়ী নিয়োগ করা :

(ক) আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا منْ رَسُوْلٍ إِلَّا بلسَان قَوْمه ليُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدي مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْعَزيْزُ الْحَكيْمُ ‘আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষি করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়’ *(ইবরাহীম ১৪/৪)*।

(খ) মহান আল্লাহ আরো বলেন, لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمنيْنَ إِذْ بَعَثَ فيْهمْ رَسُوْلًا منْ أَنْفُسهمْ يَتْلُوْ عَلَيْهمْ آيَاته وَيُزَكِّيْهمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكتَابَ وَالْحكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا منْ قَبْلُ لَفي ضَلَالٍ مُّبيْنٍ ‘নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্যে হ’তে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাদের নিকট তার নিদর্শনাবলী পাঠ করে ও তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দান করে। আর নিশ্চয় তারা এর পূর্বে প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল’ *(আলে ইমরান ৩/১৬৪)*।

মূলনীতি-১২ : দাওয়াত ও ইবাদতের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা :

(এক) আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ- قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَليْلًا- نصْفَهُ أَوِ انْقُصْ منْهُ قَليْلًا- أَوْ زدْ عَلَيْه وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتيْلًا- إِنَّا سَنُلْقي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقيْلًا ‘হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ করুন কিছু অংশ ব্যতীত’। ‘অর্ধরাত কিংবা তদপেক্ষা কিছু কম’। ‘অথবা তদপেক্ষা বেশী। আর কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে’। ‘আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী’ *(মুযযাম্মিল ৭৩/১-৫)*।

(দুই) মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ- قُمْ فَأَنْذرْ- وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ- وَثيَابَكَ فَطَهِّرْ- وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ- وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثرُ- وَلرَبِّكَ فَاصْبرْ ‘হে বস্ত্রাচ্ছাদিত!’ ‘উঠুন, সতর্ক বাণী প্রচার করুন’। ‘এবং আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন’। আপনার পরিচ্ছদ পরিষ্কার রাখুন’। অপবিত্রতা হ’তে দূরে থাকুন’। ‘অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করা হ’তে বিরত থাকুন’ এবং ‘আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করুন’ *(মুদ্দাচ্ছির ৭৪/১-৭)*। *(চলবে)*

[অনুবাদক : ২য় বর্ষ, আল-হাদীছ এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া]

আদর্শ সমাজ গঠনে লুক্বমান হাকীমের উপদেশ

-বযলুর রহমান

(২য় কিস্তি)

(ঘ) সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা :

আদর্শ সমাজ গঠনের যতগুলো নীতিমালা রয়েছে তন্মধ্যে ‘সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ’-এর ভূমিকা সর্বাগ্রে। বিষয়টি উপলব্ধি করেই লুক্বমান হাকীম (রহঃ) তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র সন্তানকে সৎকাজের প্রতি আদেশ ও অসৎকাজের প্রতি নিষেধের নছীহত প্রদান করেন। যা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করে মহান আল্লাহ জগদ্বাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ.

‘হে প্রিয় বৎস! ছালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ কর ও অসৎকাজ হ’তে নিষেধ কর এবং বিপদে-আপদে ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয় এটি দৃঢ় সংকল্পের কাজ’ *(লুক্বমান ৩১/১৭)*। শিশু বয়সে লুক্বমান হাকীম (রহঃ) তাঁর সন্তানকে যে আদর্শ শিক্ষা দিয়েছেন, তা আদর্শ সমাজ গঠনের মৌলিক সহায়ক। কেননা উক্ত শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই সে শৈশব থেকে যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্ব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত সকল স্তরে সুদৃঢ়ভাবে অবস্থান করে থাকে। যা তার জীবনের জন্য হয় মযবুত, স্বচ্ছ এবং ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের উজ্জ্বলতম প্রতীক।

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা ইসলামী শরী‘আতে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা কোন জাতি ও গোষ্ঠীর কল্যাণ ও মুক্তি এর উপরই ভিত্তিশীল। মানবতাকে যাবতীয় পাপাচার থেকে মুক্ত রাখার এটিই একমাত্র অবলম্বন। ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে সামগ্রীক পর্যায় পর্যন্ত সংশোধন ও সংস্কারের এক অনন্য উপায় হ’ল সৎকাজের আদেশ দান এবং অসৎকাজে নিষেধ প্রদান। পক্ষান্তরে এক্ষেত্রে অলসতা ও অবহেলায় রয়েছে ভয়ঙ্কর বিপদ ও চূড়ান্ত বিপর্যয়। এর গুরুত্ব-মর্যাদা ও ফযীলত চেপে রাখা এবং এ থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা কিংবা দূরে থাকাও মহা অন্যায়।

সুধী পাঠক! নির্ভেজাল তাওহীদ ও ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদা ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ‘সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ’ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধানতম অবলম্বন। এক্ষেত্রে প্রয়োজন একদল নিবেদিত প্রাণ, তাক্বওয়াশীল ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মী ও দাঈ ইলাল্লাহ। যাদের হাতেই রচিত হবে বিশ্ব মানবতার শান্তিময় সৌধের স্বচ্ছ ও সুদৃঢ় ভিত্তি।

ইসলামী শরী‘আতে এর মর্যাদা অসীম বলে স্বীকৃত। এমনকি আল্লাহ তা‘আলা কোন কোন স্থানে এটাকে ঈমানের পূর্বে উল্লেখ করেছেন। অথচ ঈমান হ’ল দ্বীনের মূলনীতি ও ইসলামী শরী‘আতের মূলভিত্তি। মহান আল্লাহ বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ.

‘তোমরাই সর্বোত্তম জাতি। মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে’ *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

বর্তমান যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিরক-বিদ‘আত সহ বিভিন্ন অনৈসলামিক রীতিনীতি বৃদ্ধির কারণে মুসলিমদের উপর সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া এটি রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের যুগেও অত্যধিক সতর্ক ও গুরুত্বের সাথে মূল্যায়িত হত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হ’ল, অত্যধিক মূর্খতা, জ্ঞানের স্বল্পতা ও উদাসীনতা এর প্রয়োজনীয়তাকে বিলীন করতে বসেছে। যা এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে আরো প্রকট করেছে। এ কাজ আরো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে এই কারণে যে, দেশে মন্দ-পাপাচারের বাহুল্যতা, বিশৃঙ্খলা-হানাহানি, খুন-রাহাজানি, সূদ-ঘুষ, যেনা-ব্যভিচার, প্রতারণা-ছলনা, হিংসা-বিদ্বেষ, ইর্ষা-অহংকার ও বিভক্তির ভয়ানক আক্রমণ এবং ভ্রান্ত পথের অসংখ্য দাঈ বৃদ্ধি ও সঠিক পথের দাঈ হ্রাস। উপরিউক্ত করুণ প্রেক্ষাপট থেকে বেরিয়ে না আসলে নির্ভেজাল তাওহীদী দাওয়াত নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ্র অধিকার ভূলুণ্ঠিত হবে। আল্লাহকে অপমান করা হবে। ফলে এক অনিবার্য হুমকির মুখে পতিত হবে মুসলিম উম্মাহ। অতএব মানবতাকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করা এবং অকল্যাণ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন হবে সফলতার একমাত্র মানদণ্ড। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

‘তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকবে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম’ *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ.

‘তুমি বিনয় ও ক্ষমা পরায়ণতার নীতি অবলম্বন কর, লোকদেরকে সৎ কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল’ *(আ‘রাফ ৭/১৯৯)*।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

'মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে-অপরের বন্ধু, তারা সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে' *(তওবাহ ৯/৭১)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوْا فَلاَ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অন্যায় কাজ হ'তে নিষেধ কর দো'আ করার পূর্বে, যখন তা কবুল হবে না।[১]

সুধী পাঠক! এখানে দু'টি দিক রয়েছে। একটি হ'ল সৎকাজের আদেশ, অন্যটি অসৎকাজে নিষেধ। যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন মূলত স্ব স্ব উম্মতদেরকে সকল অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে সৎকাজ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। অথচ কিছু ব্যবসায়ী আলেম, খত্বীব ও বক্তাগণ শুধুমাত্র সৎকাজ ও ফযীলতের ওয়ায করে থাকেন। অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে এ কথা ভুলে যান কিংবা এড়িয়ে যান। আর এটি তাবলীগী জামায়াতের মূল বৈশিষ্ট্য। ঢাকার টঙ্গীর ময়দানে কিংবা তাদের স্ব স্ব কেন্দ্রেগুলোতে স্বপ্নে পাওয়া তথাকথিত ফাযায়েলে আমল থেকে জনগণের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র ফযীলতের বয়ান করে থাকে। যা পূর্ণাঙ্গ শরী'আতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার অপকৌশল মাত্র।

'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' করার উপায় :

রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ অনুযায়ী সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের উপায় চারটি। যথা-

(ক) সামর্থ্য থাকলে হাত দ্বারা প্রতিহত করা :

সমাজের সকল স্তর আজ ইসলাম বিরোধী কর্মতৎপরতায় জর্জরিত। বর্তমানে মন্ত্রী, সচিব, প্রফেসর, প্রভাষক, আমলা, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, এমপি, আলেম, ছাত্র-শিক্ষক, চেয়ারম্যান, মেম্বার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যাংক কর্মকর্তা, বেসরকারী ও এন.জি.ও কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন পর্যায়ের পরিচালনা কমিটি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় ও বৈষয়িক সংগঠন সহ সকল পর্যায় অনৈতিকতা, প্রতারণা, ছলনা ও মিথ্যাচারের উপর পরিচালিত হচ্ছে। দেশের প্রত্যেক বিভাগ ও ব্যক্তি যেন আজ শান্তির অন্বেষায় পথ হারিয়ে ফেলছে। এরকম মুহূর্তে একজন প্রকৃত মুমিনের দায়িত্ব হ'ল, স্ব স্ব অবস্থানে থেকে বুদ্ধিমত্তার সাথে উক্ত নোংরা ও জঘন্যতম অপরাধগুলোর বিরুদ্ধে সামর্থ্যানুযায়ী হাত দ্বারা প্রতিরোধ করা। মদের ভাণ্ডগুলো ভেঙ্গে ফেলা, খেল-তামাশার যন্ত্রগুলো ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া, যারা মানুষের অনিষ্টের ইচ্ছা করে, নিজের মত প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের উপর যুলুম করে, হিংসা-অহংকারে মদমত্ত হয়ে অন্যকে হেয় গণ্য করে, অস্থায়ী ও সংকীর্ণ ক্ষমতায় স্ফীত হয়ে অধীনস্ত কর্মী ও দায়িত্বশীলদের উপর অযথা সন্দেহ ও মানসিক নির্যাতন করে সামর্থ্য থাকলে তাদেরকে হাত দ্বারা প্রতিহত করা। হাদীছে এসেছে,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ.

'তোমাদের যখন কেউ কোন অপসন্দনীয় কথা বা কাজ হতে দেখবে, তখন সে যেন হাত দ্বারা বাধা প্রদান করে। এতে সম্ভব না হ'লে, যেন কথার মাধ্যমে বাধা প্রদান করে। এটাও সম্ভব না হ'লে, সে যেন অন্তর থেকে ঘৃণা করে। আর এটিই হচ্ছে দুর্বলতম ঈমান'।[২] উল্লেখ্য যে, হাদীছে لَمْ يَسْتَطِعْ শব্দটি উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, সামর্থ্য থাকলে হাত দ্বারা প্রতিহত করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন রকম সীমালঙ্ঘন করা যাবে না। তাহলে বিশৃঙ্খলার পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাবে। যতটুকু সম্ভব ততটুকুই করতে হবে। যেমনটা বাদশা বা তাদের সমপর্যায়ের সামর্থ্যবান লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অনুরূপভাবে মানুষকে ছালাত আদায়ে বাধ্য করা, আল্লাহ্র আবশ্যকীয় হুকুম-আহকাম অনুসরণের জন্য বাধ্য করার পাশাপাশি অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলোতেও সামর্থ্য থাকলে বাধ্য করা। এভাবেই একজন মুমিনের উপর তার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহ্র নির্দেশিত পথের আদেশ করা এবং তাঁর হারামকৃত বিষয় থেকে হাত দ্বারা বাধা দেওয়া যরূরী। যখন তাদের মধ্যে শুধু মুখের বলায় কোন উপকার হবে না।[৩] একারণেই ইসলামী শরী'আতে দশ বছর বয়স হ'লে সন্তানকে ছালাত আদায়ের ব্যাপারে প্রহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।[৪]

(খ) মৌখিক ভাবে নিষেধ করা এবং ভাল কাজের পরামর্শ দেওয়া :

সমাজে ইসলাম বিরোধী কার্যক্রমগুলো মূলত ক্ষমতাশালী ও ধনাঢ্যশীল ব্যক্তিদের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়ে থাকে। যদিও তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। ফলে অনেক সময় হাত দ্বারা বাধা দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না কিংবা হ'লেও বৃহত্তর সামাজিক শৃঙ্খলার স্বার্থে তা থেকে বিরত থাকতে হয়। কিন্তু অযুহাত খাড়া করে কোন রকম নীরবতা অবলম্বন করা চলবে না। বরং তার ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ করতেই হবে। এজন্য যাবতীয় অনৈতিক ও অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতে হবে এবং ভাল কাজের দিকে আহ্বান করতে

১. ইবনু মাজাহ হা/৪০০৪, সনদ হাসান।

২. ছহীহ মুসলিম হা/১৮৬; ইবনু মাজাহ হা/৪০১৩; মিশকাত হা/৫১৩৭।

৩. শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, উজূবুল আমর বিল মা'রূফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার, পৃঃ ১৬-১৭।

৪. আবুদাঊদ হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৫৭২, সনদ হাসান, ছহীহুল জামে' হা/৫৮৬৮।

হবে ও নির্যাতিত জনগোষ্ঠীকে ধৈর্যধারণের নছীহত করতে হবে। রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ের প্রেক্ষাপট ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। নিষ্ঠুর ও বর্বরতম আচরণের শিকার হত তাঁর সম্মানিত ছাহাবীগণ। অনৈতিকতা ও অশ্লীলতায় ভরপুর ছিল তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা। কিন্তু তাঁদেরকে ধৈর্যধারণের নছীহত ছাড়া তিনি কিছুই করতে পারতেন না। এরকমই ঘটনা ঘঠেছিল ইয়াসির (রাঃ)-এর পরিবারের সাথে। যখন ইয়াসির ও তাঁর পরিবার কঠিন অত্যাচারে জর্জরিত, তখন রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে শুধুমাত্র ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছিলেন। কেননা তখন হাত দ্বারা বাধা দেওয়ার মত অবস্থা ছিল না। রাসূল (ছাঃ) ইয়াসির পরিবারকে লক্ষ্য করে অত্যন্ত দরদমাখা কণ্ঠে বলেছিলেন,

صَبْرًا يَا آلَ يَاسِرٍ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ.

'হে ইয়াসির পরিবার! ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয় তোমাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করা হয়েছে'।[৫] এজন্যই অত্যাচারী বাদশাহর সম্মুখে হক্ব কথা বলায় সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবাদ তথা জিহাদ বলে রাসূল (ছাঃ) উল্লেখ করেছেন।[৬]

অনুরূপভাবে একথা বলা যে, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহকে ভয় কর। হে আমার ভাই! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, ছালাত আদায় কর, যাকাত প্রদান কর, সব ধরণের অসৎ কাজ পরিত্যাগ কর, এভাবে এভাবে কাজ কর, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা ছেড়ে দাও, পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ কর, নিকটাত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার কর ইত্যাদি। তাদেরকে সর্বদা সৎ পরামর্শ ও সৎ উপদেশ দিবে এবং তারা যেসব অসৎ কাজ করত বা জড়িত ছিল তা থেকে বিরত রাখবে এবং সতর্ক করবে। এক্ষেত্রে তাদের সাথে কোমলতা ও সহনশীলতার সাথে উত্তম আচরণ করবে।[৭] রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الأَمْرِ كُلِّهِ.

'নিশ্চয় আল্লাহ সকল কাজে নম্রতা পসন্দ করেন'।[৮] এটাই হচ্ছে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের যথাযোগ্য পন্থা। নিম্নের হাদীছটি প্রণিধানযোগ্য :

مَا مِنْ نَبِىٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِى أُمَّةٍ قَبْلِى إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّوْنَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُوْنَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَا لاَ يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ.

'আল্লাহ তা'আলা আমার পূর্বে যখনই কোন জাতির মাঝে নবী প্রেরণ করেছেন, তখনই সেই উম্মতের মধ্যে তার এমন হাওয়ারী ও সাথী দিয়েছেন, যারা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে চলতেন, তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। অনন্তর তাদের পর এমন সব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, যারা মুখে যা বলে বেড়াত কাজে তা পরিণত করত ন। আর সে সব কর্ম তারা করত, যার জন্য তারা আদিষ্ট ছিল না। অতএব তাদের বিরুদ্ধে যারা হাত দ্বারা জিহাদ করবে তারা মুমিন, যারা এদের বিরুদ্ধে মুখের কথার দ্বারা জিহাদ করবে তারাও মুমিন এবং যারা এদের বিরুদ্ধে অন্তরের ঘৃণা দ্বারা জিহাদ করবে তারাও মুমিন। এর বাইরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান অবশিষ্ট নেই'।[৯]

রাষ্ট্রীয় নেতা, সমাজ নেতা বা ধর্মীয় নেতা যেই হোক না কেন যদি কেউ অন্যায় ও ইসলাম বিরোধী কাজের সাথে জড়িত হয় কিংবা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে অধীনস্তদের উপর দুঃশাসন চালায় এবং উক্ত কাজের কেউ যদি বিরোধিতা না করে তাহলে সেইও তাদের অনুসারী বলে বিবেচিত হবে। বরং সে ব্যাপারে যথাসাধ্য ন্যাসঙ্গতভাবে প্রতিবাদ করাই হবে মুক্তির একমাত্র পথ। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لاَ مَا صَلَّوْا أَىْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ.

উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রী থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের উপর এমন শাসকবৃন্দ নিযুক্ত করা হবে, যাদের কিছু কাজ তোমরা ভাল দেখবে এবং কিছু কাজ গর্হিত দেখবে। অতএব যে ব্যক্তি সে কাজকে ঘৃণা করবে, সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে এবং যে আপত্তি ও প্রতিবাদ জানাবে সেও পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে সম্মত হবে এবং তাদের অনুসরণ করবে (সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে)। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন, না, যে পর্যন্ত তিনি ছালাত আদায় করেন।[১০]

(গ) হৃদয় দিয়ে উক্ত কাজকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা :

যখন কোন মুমিন হাত ও মুখ দ্বারা অন্যায় কাজে বাধা দিতে অক্ষম হবে, তখন সে অন্তর দ্বারা প্রতিরোধ করবে। সে অন্তর থেকে সেই অসৎ কাজকে অপসন্দ করবে, ঘৃণা করবে এবং

৫. বায়হাক্বী-শু'আবুল ঈমান হা/১৬৩১; হাকিম হা/৫৬৪৬; ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৩৮৪৬; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ, পৃঃ ১০৩, সনদ ছহীহ।
৬. আবুদাঊদ হা/৪৩৪৪; ইবনু মাজাহ হা/৪০১১; তিরমিযী হা/২৩২৯, সনদ ছহীহ- أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ।
৭. উজূবুল আমর বিল মা'রূফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার, পৃঃ ১৭-২৩।
৮. ছহীহ বুখারী হা/৬০২৪; ছহীহ মুসলিম হা/৫৭৮৪ 'কিতাবুল বিরবি ওয়াছ-ছিলাহ' অধ্যায়-৩; মিশকাত হা/৪৬৩৮।
৯. ছহীহ মুসলিম হা/১৮৮ 'ঈমান' অধ্যায়-২০; মিশকাত হা/১৫৭।
১০. ছহীহ মুসলিম হা/৪৯০৭; আবুদাঊদ হা/৪৭৬১।

এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যখন তাকে কিছু লোক জিজ্ঞেস করেছিল এই মর্মে যে,

هلكت ان لم امر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال له رضي الله عنه–هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر.

‘আমি যদি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ না করি, তবে ধ্বংস হয়ে যাব’। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি তখনই ধ্বংস হবে, যদি তোমার অন্তর সৎ কাজকে মেনে না নেয় এবং অন্যায় কাজকে অপসন্দ না করে’।[১১]

(ঘ) সম্মিলিত শক্তি প্রস্তুত করে বৈধভাবে প্রতিহত বা প্রতিবাদ করার প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা :

ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ উপায় হ’ল সম্মিলিত শক্তি প্রস্তুত করে বৈধভাবে প্রতিহত বা প্রতিবাদ করা। যাবতীয় অনৈতিক ও ইসলাম বিরোধী শক্তিকে উৎখাত করার জন্য জোরালোভাবে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা। মাক্কী যুগে রাসূল (ছাঃ) ধৈর্যধারণ, অন্তর দিয়ে ঘৃণা ও কোন কোন স্থানে এককভাবে হাত দ্বারা শিরক-বিদ‘আত ও প্রচলিত যাবতীয় অন্যায় এবং ইসলাম বিরোধী কর্মতৎপরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। পরবর্তীতে মাদানী যুগে প্রতিপক্ষের অস্বীকৃতির মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইসলামী আদর্শ টিকিয়ে রাখার জন্য মহান আল্লাহ সম্মিলিত শক্তি প্রস্তুত করে সংগ্রাম পরিচালনার নির্দেশ দেন।[১২] যার প্রেক্ষাপটে বদর, ওহুদ, খন্দক প্রভৃতি জিহাদ ও সংঘাতের ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ইসলামের বিজয়ী নিশান পশ্চিম গগণে পত পত করে উড়েছিল। যাবতীয় অন্যায় ও অসত্যের পতন হয়েছিল। শান্তির রাজ কায়েম হয়েছিল। সুতরাং আজকেও ইহুদী-খ্রীষ্টান ও সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর চক্রান্ত ও যুলুম-নিপীড়নকে প্রতিরোধ করতে হ’লে আমাদেরকেও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ সম্মিলিত বা সাংগঠনিক শক্তি অর্জন করতে হবে। এক্ষেত্রে একদল নিবেদিত প্রাণ তাক্বওয়া সম্পন্ন ও পূর্ণ অভিজ্ঞতায় সাচ্ছা মর্দে মুজাহিদ কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। তাদেরকে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ও ধর্মীয় জ্ঞানে দক্ষ করে তৈরি করতে হবে। ফলে তাদের দাওয়াতী কাজ ও ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধের মাধ্যমেই একটা নীরব বিপ্লব সংগঠিত হবে। জনগণের মানসিকতায় বিপ্লব এনে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সকল ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে গণজোয়ার সৃষ্টি হবে। সমাজে শান্তির ফল্গুধারা প্রবাহিত হবে ইনশাআল্লাহ।

সুধী পাঠক! শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে ‘আমর বিল মা‘রূফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার’-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল ধরণের অপতৎপরতাকে যেমন যুলুম-অত্যাচার, হিংসা-বিদ্বেষ, গীবত-তোহমত, হত্যা, মিথ্যাচার, অনৈতিক কার্যক্রম, অন্যায়ভাবে অন্যের জমি দখল, অন্যের প্রতি দোষারোপ করা, সূদ-ঘুষ, প্রতারণা, ধাপ্পাবাজি, ছলনা, মিথ্যা অভিনয়, আমানতের খেয়ানত, ওয়াদা ভঙ্গ করা, ছোটদের প্রতি নির্যাতন, গরীব ও দুর্বলদের অপমান করা প্রভৃতি বিষয়ে বাধা প্রদান করা একজন মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। এক্ষেত্রে সাহসিকতার সাথে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করে দৃঢ়চিত্ত মনোবল নিয়ে নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে সামর্থ্য হ’লে সেটাকে হাত দ্বারা প্রতিহত করতে হবে। সম্ভব নাহলে মৌখিক ভাবে নিষেধ করতে হবে এবং ভাল কাজের পরামর্শ দিতে হবে। অন্যথায় হৃদয় দিয়ে উক্ত কাজকে পূর্ণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সেটা সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক কিংবা পাশ্চাত্যদের চালু করা যেকোন ধরণের অন্যায় ও গর্হিত কাজ হোক না কেন।

‘সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ’ না করার পরিণাম :

ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিবাদ না করার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। বানী ইসরাঈলরা এটা না করার কারণে তারা অভিশপ্ত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُوْدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ– كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ.

‘বানী ইসরাঈলদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা দাঊদ ও মারিয়াম পুত্র কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। কেননা তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করত তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট’ *(মায়েদা ৫/৭৮-৭৯)*।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি যদি না করা হয়, তাহ’লে ভাল-মন্দ উভয় প্রকার লোক বিপদে পড়বে ও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে। নিম্নের হাদীছটি প্রণিধানযোগ্য-

عَنْ النُّعْمَان بْنِ بَشِير رضى الله عنهما قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِى حُدُود اللَّه وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَل قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِى أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِى أَعْلاَهَا فَكَانَ الَّذِى فِى أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِى أَعْلاَهَا فَتَأَذَّوْا بِهِ فَأَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ تَأَذَّيْتُمْ بِى وَلاَ بُدَّ لِى مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَ أَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ.

নু‘মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, অন্যায়কারী ও অন্যায় দেখে যে ব্যক্তি বাধা প্রদান

১১. উজূবুল আমর বিল মা‘রূফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার, পৃঃ ২৩।
১২. বিস্তারিত দ্র. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২৬৯-২৭৪।

করে না এমন ব্যক্তিদ্বয়ের উদাহরণ হচ্ছে এক সম্প্রদায়ের মত। যে সম্প্রদায় একটি নৌকায় আরোহণের জন্য লটারী করেছে। এতে তাদের কিছু হয়েছে উপর তলার যাত্রী এবং কিছু হয়েছে নীচ তলার যাত্রী। নচী তলার লোকেরা উপর তলায় পানি আনতে যায়। এতে উপর তলার লোকের কষ্ট হয়। তখন নীচ তলার একজন কুড়াল দিয়ে পানি বের করার জন্য নৌকার তলা ছিদ্র করতে উদ্ধত হয়। তারপর উপর তলার লোক এসে বলে, তোমার কি হয়েছে, তুমি এমন করছ কেন? তখন তারা বলল, আমরা নীচ তলা থেকে পানি আনতে গেলে তোমাদের কষ্ট হয়। আবার আমাদের পানিরও খুব দরকার। (এ কারণে নৌকার তলায় ছিদ্র করে পানি উত্তোলন করব।) উপরের লোকেরা যদি তার কুড়ালটি নিয়ে নেয় এবং তাকে একাজ থেকে বারণ করে তাহলে তারা তাদেরকে বাঁচাবে এবং নিজেদেরকেও বাঁচাবে। আর যদি তাকে ছেড়ে দেয়, বাধা না দেয়, তাহলে তাদেরকে ডুবিয়ে ধ্বংস করবে এবং নিজেদেরকেও ধ্বংস করবে।[১৩]

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

হুযায়ফা ইবনু ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তাঁর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! তোমরা অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ হ'তে নিষেধ করবে, তা নাহলে শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর শাস্তি পাঠাবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর কোছে দো'আ করবে; কিন্তু তা কবুল করা হবে না।[১৪]

عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هَذِهِ الآيَةَ وَتَضَعُوْنَهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِى ثُمَّ يَقْدِرُوْنَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوْا ثُمَّ لاَ يُغَيِّرُوْا إِلاَّ يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ.

আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেন, হে লোক সকল! তোমরা এই আয়াত পড়, হে মুমিনগণ! তোমাদের আত্মরক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না *(মায়েদা ৫/১০৫)*। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যখন লোকেরা অত্যাচারীকে দেখবে এবং তার হাত ধরে না নেবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে তার শাস্তির কবলে নিয়ে যাবেন।[১৫]

উল্লেখ্য, ন্যায় কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজে নিষেধকারী ব্যক্তি যদি নিজে সৎকাজ না করে এবং অসৎকাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, তাহ'লে তার জন্যও ভয়াবহ শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِى النَّارِ فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ أَىْ فُلاَنُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ.

উসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং সে তার চারিপাশে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা তার চাকির চারিপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামীরা তার কাছে একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা দান করতে? সে বলবে, অবশ্যই। আমি তোমাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিতাম, কিন্তু আমি তা নিজে করতাম না এবং অসৎ কাজে বাধা দিতাম, অথচ আমি নিজেই তা করতাম।[১৬]

'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' করার প্রতিদান :

আল্লাহ তা'আলা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার কাজ দু'টি অত্যন্ত কল্যাণকর বলে উল্লেখ করেছেন। যারা এ কাজ করে থাকে তারা সফলতা লাভ করে। উক্ত কাজের সদস্য সংখ্যাও অত্যন্ত কম হয়। আর তাদের জন্যই রয়েছে সুসংবাদ। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকবে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের আদেশ করবে ও

---

১৩. ছহীহ বুখারী হা/২৪৯৩; তিরমিযী হা/২১৭৩; মুসনাদে আহমাদ হা/১৮৩৮৭।

১৪. তিরমিযী হা/২১৬৯; মুসনাদে আহমাদ হা/২৩৩৪৯; মিশকাত হা/৫১৪০; ছহীহুল জামে' হা/৭০৭০, সনদ ছহীহ।

১৫. আবুদাঊদ হা/৪৩৩৮; তিরমিযী হা/২১৬৮; মিশকাত হা/৫১৪২; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৬৪।

১৬. ছহীহ বুখারী হা/৩২৬৭; মুসনাদে আহমাদ হা/২১৮৩২; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৩৯।

অসৎকাজে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ غَرِيْبًا فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইসলাম এসেছিল অল্প সংখ্যক লোকের মাধ্যমে। আবার অল্প সংখ্যক লোকদের নিকটেই তা প্রত্যাবর্তন করবে। সেই অল্প সংখ্যক লোকদের জন্যই জান্নাতের তূবা গাছের সুসংবাদ।[১৭] উক্ত অল্প সংখ্যক লোক ক্বিয়ামত পর্যন্ত ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করেই যাবে। কোন ষড়যন্ত্রকারীর ষড়যন্ত্রকে তারা পরোয়া করবে না। হাদীছে এসেছে,

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ.

ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, একটি দল চিরদিন হক্বের উপর বিজয়ী থাকবে। ষড়যন্ত্রকারীদের কোন ষড়যন্ত্র তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত সংগঠিত হবে কিন্তু তারা ঐভাবেই থাকবে।[১৮] ফালিল্লাহিল হামদ।

সুধী পাঠক! যারা উক্ত মর্মে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তারা শত বাধাবিপত্তির মধ্যেও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। যারা করে না তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

أَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُوْنَ.

'যে উপদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হ'ল, তখন যারা মন্দ কাজে বাধা দান করত তাদেরকে আমি উদ্ধার করলাম এবং যারা অত্যাচারী ছিল তারা সত্যত্যাগ করত বলে আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তির সাথে পাকড়াও করলাম' *(আ'রাফ ৭/১৬৫)*।

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

'হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা প্রচার করুন। আর যদি তা না করেন, তাহ'লে আপনি আপনার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের হেদায়াত করেন না' *(মায়েদা ৫/৬৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ 'যে ব্যক্তি কল্যাণের পথ দেখাবে সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ নেকী পাবে, যে ঐ পথে চলবে'।[১৯]

তবে উক্ত কাজের সবচেয়ে বড় প্রতিদান হ'ল একটি লাল উটের চেয়েও মূলবান। খায়বার যুদ্ধে আলী (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে রাসূল (ছাঃ) বললেন,

فَقَالَ انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِىَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.

'তুমি সোজা এগিয়ে যেতে থাক এবং তাদের আঙ্গিনায় পৌঁছে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও। অতঃপর তাদের প্রতি আল্লাহ কর্তৃক ফরযকৃত বিষয়গুলো জানিয়ে দাও। আল্লাহ্র কসম! তোমার দ্বারা যদি একটি মানুষও হেদায়াত লাভ করে, তাহ'লে তা হবে তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম'।[২০]

সুধী পাঠক! উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হ'ল যে, সমাজের অধীনস্ত জনসাধারণ যদি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি যথাযথভাবে সম্পূর্ণ করে, তাহ'লে সমাজ পরিবর্তন ও তার সংস্কার সাধন সময়ের ব্যাপার মাত্র। উক্ত কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, উপায়-অবলম্বন, পরিণাম ও প্রতিদান জানার পরেও কোন মুসলিম যুবকের নীরব ভূমিকা পালন করার কোন সুযোগ থাকে না। এজন্য লুক্বমান হাকীম (রহঃ) ছোট্ট বয়সে তাঁর প্রাণপ্রিয় শিশু পুত্রকে হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসার কণ্ঠে উপদেশ দিয়ে বলেন, হে আমার কলিজার টুকরা! ছালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ কর ও অসৎকাজ হ'তে নিষেধ কর এবং বিপদে ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয় এটি দৃঢ় সংকল্পের কাজ' *(লুক্বমান ৩১/১৭)*। যাতে করে সে যৌবনে পদার্পণ করে আপোষকামী না হয়ে চিরন্তন সত্যের পথে সংগ্রাম করতে পারে। আর ছোট্ট বয়সেই যদি কোন ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, জীবন-যাপন ও চলাফেরা উক্ত উপদেশের আলোকে হয়ে থাকে, তাহ'লে সমাজের এই করুণ পরিণতি থেকে উত্তরণ হওয়া সম্ভব। অন্যথায় অসম্ভব। তবে এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে সচেতন অভিভাবকগণের দৃঢ়চিত্ত মনোবল ও আপোসহীন মানসিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিণত হতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন-আমীন!! *(চলবে)*

[লেখক : এম.ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

---

১৭. ছহীহ মুসলিম হা/৩৮৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৮৬; মিশকাত হা/১৫৯।
১৮. ছহীহ মুসলিম হা/৫০৫৯।
১৯. ছহীহ মুসলিম হা/৫০০৭; আবুদাঊদ হা/৫১২৯; তিরমিযী হা/২৬৭১; মিশকাত হা/২০৯।
২০. বুখারী হা/৩৭০১ ও ৪২১০; আবুদাঊদ হা/৩৬৬১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬০৮০।

কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ঈমানের শাখা

-হাফেয আব্দুল মতীন

(৩য় কিস্তি)

(১৮) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা :

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ 'এবং আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমান (ছালাত) বিনষ্ট করবেন' *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ 'তোমরা ছালাত প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত প্রদান কর' *(বাক্বারাহ ২/৪৩)*। অতএব হে মানব জাতি! নির্দিষ্ট সময়ে তোমরা ছালাত আদায় কর। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا 'নিশ্চয় ছালাত বিশ্বাসীগণের উপর নির্দিষ্ট সময়ে আদায়ের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে' *(নিসা ৪/১০৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي 'আর তুমি ছালাত কায়েম কর আমাকে স্মরণ করার জন্য *(ত্বহা ২০/১৪)*। হে মানব জাতি! নিজে ছালাত আদায় কর এবং পরিবার, সন্তান-সন্ততিদেরকেও ছালাত প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ কর। মহান আল্লাহ বলেন, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا 'আর তোমরা পরিবারবর্গকে ছালাত আদায়ের আদেশ কর ও তাতে নিজেও অটল থাক' *(ত্বহা ২০/১৩২)*। মহান আল্লাহ লুক্বমান সম্পর্কে বলেন, يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ 'যখন তিনি তাঁর সন্তানকে বলেছিলেন, 'হে আমার প্রিয় বৎস! ছালাত কায়েম কর, ভাল-কাজের আদেশ ও মন্দকাজ থেকে নিষেধ কর, আর বিপদের মুহূর্তে ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয় এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ' *(লুক্বমান ৩১/১৭)*।

হে মানব জাতি! বিনয়-নম্র সহকারে ছালাত আদায় কর। মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ 'যারা তাদের নিজের ছালাত (ভয়-ভীতি) বিনয়-নম্র সহকারে আদায় করে' *(মুমিনূন ২৩/২)*।

হে মানব জাতি! পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করার চেষ্টা কর। ছালাতকে হিফাযত কর। এ ছালাতই তোমাকে কল্যাণের ও জান্নাতের পথ ধরায়ে দিবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ- أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ-الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. 'আর যারা তাদের নিজের ছালাত যত্ন সহকারে আদায় করে। তারাই উত্তরাধিকারী হবে। উত্তরাধিকারী হবে (জান্নাতুল) ফেরদাউসের। সেখানেই তারা চিরস্থায়ী বসবাস করবে *(মুমিনূন ২৩/৯-১১)*।

হে মানব জাতি! ছালাত ঠিকভাবে আদায় কর। ছালাতই তোমাকে শিরক-বিদ'অত, কুফরী সহ সকল অপকর্ম থেকে হিফাযতে রাখবে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 'নিশ্চয় ছালাত সকল অন্যায়-অশ্লীলতা কাজ-কর্ম থেকে বিরত রাখে' *(আনকাবূত ২৯/৪৫)*। অতএব তোমরা রাসূলের দেখানো পদ্ধতিতে ছালাত আদায় কর। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى 'তোমরা ছালাত আদায় কর সেভাবে, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ'।[২১] তাই মানব জাতির উচিত ছালাত ঠিকভাবে আদায় করা, কারণ ছালাত ত্যাগকারীর পরিণতি খুব ভয়াবহ। রাসূল (ছাঃ) ছালাত ত্যাগ করাকে মুসলিম থেকে খারিজ বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ 'মুমিন ও কাফের মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হল ছালাত'।[২২] সুতরাং ছালাত ত্যাগ না করে ছালাতে যত্নবান হয়ে সঠিক সময়ে ছালাত আদায় করা সবার উপর আবশ্যক কর্তব্য।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِى.

আবু আমর শায়বানী (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এ বাড়ির মালিক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমলটি আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, যথা সময়ে ছালাত আদায় করা। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর কোন্টি? তিনি বললেন, অতঃপর পিতা-মাতার খেদমত করা (তাদের উভয়ের সাথে উত্তম ব্যবহার করা)। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) আবার জিজ্ঞেস কররেন, অতঃপর কোন্টি? আল্লাহ্র

২১. বুখারী হা/৬৩১।
২২. আহমাদ হা/১৪৯৭; মুসলিম হা/২৫৬।

রাসূল (ছাঃ) বললেন, অতঃপর আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। (আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য খালেছ নিয়তে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা)। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, এগুলোতো আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাকে বলেছেনই, যদি আমি আরও অধিক জানতে চাইতাম, তাহলে তিনি আরও বলতেন।[২৩]

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত যারা নিয়মিত ঠিক সময় পড়বে তাদের জীবনের পাপ সমূহ মহান আল্লাহ মার্জনা করে দিবেন। তবে বড় গুনাহ করলে তওবা করতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন,

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِى مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لاَ يُبْقِى مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا.

‘বলতো যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহ’লে কি তার দেহে কোন ময়লা থাকবে? তারা বললেন, তার দেহে কোনরূপ ময়লা বাকী থাকবে না। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, এ হ’ল পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা (বান্দার) গুনাহ সমূহ মিটিয়ে দেন’।[২৪] মানব জাতির উচিত জামা‘আতের সাথে ছালাত আদায় করা। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ‘জামা‘আতে ছালাত আদায়ের ফযীলত (একাকী) আদায়কৃত ছালাত অপেক্ষা সাতাশগুণ বেশী’।[২৫]

(১৯) যাকাত আদায় করা :

যাকাত প্রদান সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ‘তারাতো আদিষ্ট হয়েছিল বিশুদ্ধচিত্তে ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র আনুগত্য করতে, তাঁরই একমাত্র ইবাদত করতে এবং ছালাত কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত সঠিক দ্বীন’ *(বাইয়েনাহ ৯৮/৫)*।

কারো উপর যাকাত ফরয হলে অবশ্যই তাকে আদায় করতে হবে, নচেৎ এর জন্য পরপারে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ- يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.

‘আর যারা (অতিলোভের বশবর্তী হয়ে) স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, (হে মুহাম্মাদ ছাঃ) আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। যেদিন জাহান্নামের আগুনে ঐগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে অতঃপর তা দ্বারা তাদের ললাটসমূহে পার্শ্বদেশ সমূহে এবং পৃষ্ঠদেশ সমূহে দাগ দেয়া হবে। (আর বলা হবে) এটা হচ্ছে সেটাই, যা তোমরা নিজেদের জন্যে সঞ্চয় করেছিলে। অতএব তোমরা তার স্বাদ গ্রহণ কর’ *(তওবাহ ৯/৩৪-৩৫)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ‘আর আল্লাহ যাদেরকে স্বীয় প্রতিদান হ’তে কিছু দান করেছেন সে বিষয়ে যারা কার্পণ্য করে, তারা যেন এরূপ ধারণা না করে যে, ওটা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে; বরং সেটা তাদের জন্য ক্ষতিকর’ *(আলে ইমরান ৩/১৮০)*।

মানব জাতির আবশ্যকীয় কর্তব্য হ’ল, যাকাতের ধন-সম্পদ বের করা এবং এর অধিকারীদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা। যে বখীলরা যাকাত বের না করে জমা করে রাখে এবং ধারণা করে যে, তাদের জন্য সে মাল উপকারে আসবে। প্রকৃতপক্ষে তাদের সে মাল দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য কোন উপকারে আসবে না। অন্যদিকে যাকাতের মাল বের না করলে তাদের কোন মালে বরকত থাকে না, আল্লাহ বরকত উঠিয়ে নেন। বরং যাকাত প্রদান করলে মালের পবিত্রতা অর্জন হয়, মাল বৃদ্ধি পায় এবং ক্বিয়ামতের কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা পাবে’।[২৬] ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু‘আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামনে (দাওয়াতী কাজ ও শাসক নিয়োগ করে) পাঠানোর সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাঁকে বলেছিলেন,

إِنَّكَ سَتَأْتِى قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

২৩. আহমাদ হা/৩৮৯০; বুখারী হা/৫২৭; মুসলিম হা/৮৫।
২৪. আহমাদ হা/৮৯২৪; বুখারী হা/৫২৮; মুসলীম হা/৬৬৭।
২৫. আহমাদ হা/৫৩৩২; বুখারী হা/৬৪৫; মুসলীম হা/৬৫০।
২৬. তাফসীর ইবনে কাছীর ৩/২৭৭-২৭৮ পৃঃ।

'তুমি আহলে কিতাবের কাছে যাচ্ছ। কাজেই তাদের কাছে যখন পৌঁছবে, তখন তাদেরকে এ কথার দিকে দাওয়াত দিবে তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল ও বান্দা। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয় তবে তাদের বলবে যে, আল্লাহ তাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যদি তারা এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদের বলবে যে, আল্লাহ তাদের উপর ছাদাক্বাহ (যাকাত) ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট হ'তে গ্রহণ করা হবে এবং অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করে হবে। তোমার এ কথা যদি তারা মেনে নেয়, তবে (কেবল) তাদের উত্তম মাল গ্রহণ হ'তে বিরত থাকবে এবং মযলুমের বদ দো'আকে ভয় করবে। কেননা তার (বদদো'আ) এবং আল্লাহ্র মাঝে কোন পর্দা থাকে না'।[২৭] আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِى شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ لاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ الآيَةَ .

'যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো (বিষের তীব্রতার কারণে) মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্বে কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জামাকৃত মাল। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তিলাওয়াত করেন, 'আল্লাহ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করছে তাদের ধারণা করা উচিৎ নয় যে, সেই সম্পদ তাদের কল্যাণ বয়ে আনবে, বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণ কর হবে। অচিরে ক্বিয়ামত দিবসে, যা নিয়ে কার্পণ্য করছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃংখলাবদ্ধ করা হবে'।[২৮]

(২০) ছিয়াম পালন করা :

মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 'হে ইমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমনভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যাতে তোমরা আল্লাহভীরু মুত্তাকী হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'মুমিন ব্যক্তিদের উপর মহান আল্লাহ ছিয়াম ফরয করেছেন, আর এ ফারয পূর্ববর্তী নবী-রাসূল মুমিনদের উপরও ফরয করেছিলেন। ছিয়াম পালনের মধ্যে মানব জাতি অন্যায়-অপচয় থেকে দূরে থাকে, নফসের যাকাত আদায় করা হয় এবং পবিত্রতা অর্জন করতে পারে। রাসূলের উত্তম চরিত্র গ্রহণ করতে পারে, খারাপ চরিত্র থেকে দূরে থাকে পরহেযগারীতা অর্জন করতে পারে এবং ছিয়াম পালনের মাধ্যমে বান্দার ইহলোক-পরলোক কল্যাণময় হয়'।[২৯]

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন,

بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য প্রদান করা যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র বান্দা এবং রাসূল। ছালাত ক্বায়েম করা। যাকাত আদায় করা। হাজ্জ সম্পাদন করা এবং ছিয়াম পালন করা'।[৩০] ছিয়াম সাধনের মাধ্যমে বান্দা ইহলোক-পরলোকে কল্যাণ লাভ করতে পারবে। মহান আল্লাহ ছিয়াম সাধনের জাযা বা পুরস্কার নিজ হাতেই দিবেন। আবূ হুরায়বা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

الصِّيَامُ جُنَّةٌ ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِى الصِّيَامُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.

'ছিয়াম ঢাল স্বরুপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মূর্খের মত কাজ করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুই বার বলে, আমি ছিয়াম সাধনা করছি। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই ছিয়াম সাধনাকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মিসকের সুগন্ধির চাইতেও উৎকৃষ্ট। সে আমার জন্য আহার, পানাহার ও কামাচার পরিত্যাগ করে। ছিয়াম আমারই জন্য সাধনা করা হয়। অতঃএব এর পুরস্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশগুণ করে দিব'।[৩১]

[লেখক : এম.এ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব]

---

২৭. আহমাদ হা/২০৭১; বুখারী হা/১৪৯৬; মুসলিম হা/১৯।
২৮. সূরা আলে ইমরান ৩/১৮০; আহমাদ হা/৮৬৬১; বুখারী হা/১৪০৩।
২৯. তাফসীর ইবনে কাছীর ২/১৭৩ পৃঃ।
৩০. আহমাদ হা/৬০১৫; বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১৬।
৩১. আহমাদ হা/৯৯৯৮; ৯৯৯৯; বুখারী হা/১৮৯৪; মুসলিম হা/১১৫১।

বিশ্ব ভালবাসা দিবস : প্রগতির আড়ালে অশ্লীলতার বিজ্ঞাপন

-লিলবর আল-বারাদী

ভূমিকা :

নোংরা ও জঘন্য ইতিহাসের স্মৃতিচারণ হ'ল 'বিশ্ব ভালবাসা দিবস'। এটি মানবতার অসুস্থ মানসিকতার নোংরা বহিঃপ্রকাশ। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও শ্লীলতাহানীর এক জঘন্য অনুষ্ঠানের নাম হ'ল 'ভালবাসা দিবস'। আধুনিক সভ্যতার উৎকর্ষতার যুগে মানুষের বিবেক আজ নৈতিকতাহীন জড় পদার্থে পরিণত হয়েছে। যেখানে লজ্জাহীনতা, স্থীতিশীল সামাজিক কাঠামো, নৈতিকতার পূর্ণ আবহ ও শান্তির পরিমাণ শূন্যের কোঠায়। সত্যিই বড়ই আফসোস!! তাছাড়া এটি প্রগতির নামে নবাবিষ্কৃত পশ্চিমা অপসংস্কৃতি হিংস্র আক্রমণ ছাড়া কিছুই নয়। ইতিহাসটি অনেক পুরানো।

বিশ্ব ভালবাসা দিবসের উৎপত্তি :

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে, যিশু খ্রীষ্ট আগমনের পূর্বে পৌত্তলিকরা বিভিন্ন দেবতার পূজা করত। দেবতার নামে নানা রকম আচার-অনুষ্ঠানাদি পালন করত। অনুষ্ঠান সমূহের কর্মসূচী ছিল যুবতীদের নামে লটারী করা। অর্থাৎ লটারিতে যে যুবতীর নাম যে যুবকের ভাগ্যে পড়ত, সে যুবক আগামী এক বছর ঐ দিন আসার আগ পর্যন্ত তার সাথে লিভ টুগেদার করবে। ঐদিনকে 'যুবতী বণ্টনে'র দিনও বলা হত। ১০ ফেব্রুয়ারী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। খ্রীষ্ট ধর্ম মতে যীশু-খ্রীষ্টের ভূমিষ্টের পর তারা তাদের ধর্মীয় নিয়মানুযায়ী এই কুসংস্কারপূর্ণ দিবসটি পরিবর্তন করে ১৪ ফেব্রুয়ারী তারিখে সাধু পাদ্রির নাম দিয়ে আবারও পালন করতে লাগল। যা পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী 'ভ্যালেন্টাইন ডে' বা 'ভালবাসা দিবস' হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। ২৭০ সালের চৌদ্দই ফেব্রুয়ারীর কথা তখন রোমের সম্রাট ছিলেন ক্লডিয়াস। সে সময় ভ্যালেন্টাইন নামে একজন সাধু তরুণ লোক ছিলেন। যিনি যুবক-যুবতীদেরকে গোপন পরিণয়মন্ত্র দীক্ষা দিতেন। এ অপরাধে সম্রাট ক্লডিয়াস সাধু ভ্যালেন্টাইনের শিরচ্ছেদ করেন। তার এ ভ্যালেন্টাইন নাম থেকেই এ দিনটির নামকরণ করা হয় 'ভ্যালেন্টাইন ডে', যা আজকের 'বিশ্ব ভালবাসা দিবস'। যেখানে প্রকৃত প্রেম-ভালবাসার কোন লেশ মাত্র নেই। বরং নোংরামি ও নষ্টামির প্রত্যক্ষ মাধ্যম বলা চলে।

বাংলাদেশে ভালবাসা দিবসের আবির্ভাব :

বাংলাদেশে এ দিবসটি ১৯৯৩ সাল থেকে উদযাপন করা শুরু হয়। কিছু ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের মদদে এটি প্রথম চালু হয়। তখনই ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ার কতিপয় অপরিণামদর্শী কর্মীরা এর ব্যাপক কভারেজ দেয়। লুফে নেয় বাংলার হুজুগ তরুণ-তরুণীরা। এদেশে শফিক রেহমান সর্বপ্রথম ভালবাসা দিবসের সূচনা করেছিলেন। যিনি ছিলেন প্রগতিশীল মুক্তমনা সাংবাদিক ব্যক্তিত্ব। পড়াশোনা করেছেন লন্ডনে। পাশ্চাত্যের ধ্বজাধারী আধুনিক রীতিনীতিতে তিনি ছিলেন অভ্যস্ত। এ নিয়ে অনেক ধরনের মতবিরোধ থাকলেও শেষ পর্যন্ত শফিক রেহমানের চিন্তাটি নতুন প্রজন্মকে বেশি আকর্ষণ করে। সেই থেকে এই আমাদের দেশে দিনটির যাত্রা শুরু। এজন্য শফিক রেহমানকে বাংলাদেশের 'ভালবাসা দিবসে'র জনক বলা হয়।[৩২] ফলে তারই কারণে বাংলার সহজ-সরল মুসলিম ঘরের উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়ে কিংবা তরুণ-তরুণীরা প্রকাশ্য অশ্লীলতা ও বেহায়াপনায় মেতে উঠে। ধ্বংস করে দেয় তাদের আগামী দিনের সোনালী ভবিষ্যৎ। যা সত্যিই দুঃখজনক বৈকি।

ভালবাসা দিবসের কর্মসূচী ও প্রভাব :

ভালবাসা দিবস পালনের মধ্য দিয়ে ঈমানের ঘরে ভালবাসার পরিবর্তে অন্যায় ও সন্দেহের বাসা বেঁধে দেয়ার কাজটা যথারীতি চলছেই, যা মানুষ একটুও ভেবে দেখে না। এর ঠিক পিছনেই মানব জাতির আজন্ম শত্রু শয়তান এইডস নামক মরণ-পেয়ালা হাতে নিয়ে দাঁত বের করে হাসছে। মানুষ যখন বিশ্ব ভালবাসা দিবস সম্পর্কে জানত না, তখন পৃথিবীতে ভালবাসার অভাব ছিল না। কিন্তু আজ পৃথিবীতে ভালবাসার বড়ই অভাব। তাই দিবস পালন করে ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়! আর হবেই না কেন! অপবিত্রতা, নোংরামি আর শঠতার মাঝে তো আর ভালবাসা মত উত্তম বস্তু থাকতে পারে না। তাই মহান আল্লাহ মানুষের হৃদয় থেকে ভালবাসা উঠিয়ে নিয়েছেন।

বিশ্ব ভালবাসা দিবসকে চেনার জন্য আরও কিছু বাস্তব নমুনা পেশ করা দরকার। দিনটি যখন আসে তখন শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তো একেবারে বেসামাল হয়ে উঠে। নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য উজাড় করে প্রদর্শনের জন্য রাস্তায় নেমে আসে। শুধুই কি তাই! অঙ্কন পটীয়সীরা উল্কি আঁকার জন্য পসরা সাজিয়ে বসে থাকে রাস্তার ধারে। তাদের সামনে তরুণীরা পিঠ, বাহু আর হস্তদ্বয় মেলে ধরে পসন্দের উল্কিটি এঁকে নেয়ার জন্য। তারপর রাত পর্যন্ত নীরবে-নিভৃতে প্রেমিক বা প্রেমিকার সাথে খোশগল্প, চুটিয়ে আড্ডা, অসামাজিকতা, অনৈতিকতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নগ্নতা সবশেষে কখনো কখনো অবৈধ যৌন মিলন ও ধর্ষণ। এ হ'ল বিশ্ব ভালবাসা দিবসের প্রচ্ছন্ন চিত্র! এ হ'ল বিশ্ব ভালবাসা দিবসের কর্মসূচী! তাই এদিনকে 'বিশ্ব ভালবাসা দিবস' না বলে, বরং 'বিশ্ব বেহায়াপনা দিবস' বললে অন্তত নামকরণটি যথার্থ হত। সত্যি কথা বলতে কি, অবাধ মেলামেশার সুবর্ণ সুযোগ পেলে কেউ বাঁধার প্রাচীরে আবদ্ধ থাকতে চায় না। উন্মুক্ত গগণে মুক্ত বিহঙ্গের মত ছুটে বেড়াতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তথাকথিত দিবস পালনের নামে

৩২. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৪; 'কবে থেকে ভালোবাসা দিবসের শুরু'।

পর পুরুষ-পর নারীর পারস্পরিক অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে কেন? বৈধ উপায়ে ইসলামী শরী'আত সম্মত উপায়ে প্রেম-ভালবাসাই সর্বোত্তম। যা পবিত্র বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমেই কেবল সম্ভব। অতএব হে তরুণ-তরুণী, সাবধান!

উল্লেখ্য, এখানে বৈধ-অবৈধ, ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণ এ যেন বিবেচনার সুযোগ নেই। ভালবাসা বললেই যেন বৈধ কথাটা হারিয়ে যায়। কিন্তু কেন? ইসলাম ভালবাসার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে কিন্তু অবৈধ ভালবাসাকে কখনো অনুমোদন করেনি। ইসলামী ভালবাসার রূপরেখা হ'ল পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন-যাপন পদ্ধতি। ইসলামী শরী'আতের যথাযথ অনুসরণ, হালাল-হারামের সীমারেখা, শালীন পোশাক-পরিচ্ছেদ, আত্মিক ও দৈহিক সৌন্দর্যবোধ, সুস্থ বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত বিষয়াবলীই মূলত ভালবাসার প্রকৃত মানদণ্ড।

ফলাফল :

বিশ্ব ভালবাসা দিবসের চূড়ান্ত ফলাফল হ'ল দুঃখ, কান্না, ও স্থায়ী বিষন্নতা এবং নিষ্ক্রিয় চেতনার মায়াহীন একাকিত্ব। ফলে মানব সমাজ আজ অসামাজিকতা, অনৈতিকতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নগ্নতা ও অবৈধ যৌনতার বিষাক্ত ছোবলে চরমভাবে আক্রান্ত। মানবিক, নৈতিক, পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ মারাত্মক ভাবে বিঘ্নিত। তাই সমাজ জীবনে তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী নানা ধরনের মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার বিষাক্ত ফল প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হচ্ছে। মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। সমাজে দায়-দায়িত্বহীনভাবে অবাধ যৌনতার প্রসার ঘটছে। বিবাহ নামক পবিত্র দায়িত্বপূর্ণ সামাজিক বন্ধনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত বৈধ যৌন সম্পর্কের প্রতি মানুষ আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। সমাজ ও সভ্যতা ধীরে ধীরে অসভ্য, বর্বর ও পাশবিক সমাজের দিক ধাবিত হচ্ছে। মনুষত্ব হারিয়ে পশুত্ব বরণ করে নিচ্ছে। পারিবারিক ও সামাজিক পবিত্র বন্ধন শিথিল হয়ে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। যা ওপেন সিক্রেট!

বাঁধাহীন অশ্লীলতার মারাত্মক সয়লাবে কলুষিত সমাজে শান্তির লেশমাত্র নেই। অন্যদিকে ধর্ষণ, পরকীয়া, অবৈধ গর্ভধারণ ও গর্ভপাত, আত্মহত্যা, মানসিক বিকৃতি, সংসার ভাঙ্গন ও অবৈধ সন্তানের ব্যাপক প্রাদুর্ভাবে সমাজ জীবনে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও মারাত্মক অবনতি ঘটছে। ফলে সমাজে চুরি, ডাকাতি, লুট, ছিনতাই, রাহাজানি, গুম ও খুন ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শান্তির এতটুকু অংশ আজ ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ধিক, এই শিক্ষিত মানবতার ও আধুনিক সভ্যতার, যেখানে শান্তির পরিবর্তে অশান্তির ছোবলে জর্জরিত মানবতা!

অপসংস্কৃতি ও ইসলাম :

অপসংস্কৃতির বিষাক্ত ব্যাধিতে মুসলিম উম্মাহ আজ ভারাক্রান্ত। মুসলিম হিসাবে আমাদের জানা থাকা দরকার, বিবাহের পূর্বে তরুণ-তরুণীর পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ, কথা-বার্তা, মিলামিশা, প্রেম-ভালবাসা ইসলামী সংবিধানে সম্পূর্ণভাবে হারাম। পবিত্র কুরআন ও হাদীছের আলোকে ভালবাসা কেবল বিবাহের পরে-ই। বিয়ের পরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ভালবাসা সৃষ্টি হয় এর মধ্যেই রয়েছে চিরন্তন কল্যাণ ও মুক্তির বার্তা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ. 'আল্লাহ তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ কর এবং তোমাদের পরস্পরের মাঝে হৃদ্যতা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন' *(রূম ৩০/২১)*। অতএব সুখময় দাম্পত্য জীবনের জন্য পরস্পরের প্রতি দয়া, সহমর্মিতা ও সহনশীলতাপূর্ণ ভালবাসার একান্ত প্রয়োজন।

ইসলামের দৃষ্টিতে যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাসী তারা শুধুমাত্র হৃদয়ের আবেগে বা নফসের কামনা-বাসনায় কিংবা জৈবিক লালসায় অবৈধ ভালবাসার লাগামহীন পথে পা বাড়ায় না, বরং তারা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সর্বদা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখা মেনে চলেন। কেবলমাত্র ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের লক্ষ্যে পবিত্র বিবাহ নামক সামাজিক বন্ধনের মাধ্যমেই নারী-পুরুষের স্বীকৃত বৈধ দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তারা অপসংস্কৃতির শিকার হয়ে কখনো অন্যায় পথে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন না। মুমিনদের এই পবিত্র ভালবাসার দায়-দায়িত্ব ও কল্যাণকর প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. 'মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের অভিভাবক ও বন্ধু। তারা ভাল কাজের আদেশ দেয়, খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, ছালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। আল্লাহ তাদের প্রতি অচিরেই রহমত নাযিল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্য এমন জান্নাতের অঙ্গীকার করেছেন, যে জান্নাতের নীচ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন মহাপবিত্র স্থায়ী বাসস্থান আদন নামক জান্নাতের। বস্তুত: আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এটাই সবচেয়ে বড় সফলতা' *(তওবা ৯/৭১-৭২)*। অতএব আধুনিক সংস্কৃতির নামে ইসলাম বিরোধী যত ভাল কিছুই আবিষ্কার করা হোক না কেন, তা বৈধ নয়। বরং পরিত্যাজ্য।

ভালবাসার স্বরূপ ও প্রকৃতি :

'ভালবাসা' পৃথিবীর সবচেয়ে মধুর, কোমল, দুরন্ত ও মানবিক এক অনুভূতির নাম। ভালবাসা নিয়ে ছড়িয়ে আছে কত শত পৌরাণিক উপাখ্যান। সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি সর্বত্রই পাওয়া

যায় ভালবাসার সন্ধান। এই ভালবাসা গড়ে উঠে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার অকৃত্রিম বন্ধন গড়ে ওঠে বিবাহের পর। তাই বলা হয়, দু'টি মনের অভিন্ন মিলনকে ভালবাসা বলে। এই ভালবাসার রূপকার মহান আল্লাহ। তাই ভালবাসা ইতিবাচক। আর মহান আল্লাহ সকল ইতিবাচক কর্মসম্পাদনকারীকেই ভালবাসেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 'এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না। তোমরা সৎকর্ম কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুহসিনদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। ভুলের পর ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং পবিত্রতা অবলম্বন করা এ দু'টিই ইতিবাচক কর্ম। তাই আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকেও ভালবাসেন। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*। তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি সকল কল্যাণের মূল। আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদেরকে খুবই ভালবাসেন। এমর্মে তিনি বলেন, فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ 'আর নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/৭৬)*।

ভালবাসা হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা এক অদৃশ্য সুতোর টান। কোন দিন কাউকে না দেখেও যে ভালবাসা হয় এবং ভালবাসার গভীর টানে রূহের গতি এক দিনের দূরত্ব পেরিয়েও যে দুই মুমিনের সাক্ষাৎ হ'তে পারে, তা ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর এক বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, النِّعَمُ تُكْفَرُ والرَّحِمُ تُقْطَعُ ولَم نَرَ مِثل تَقَارُبِ القُلُوب 'কত নে'মতের শুকরিয়া করা হয় না, কত আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হয়, কিন্তু অন্তরসমূহের ঘনিষ্ঠতার মত (শক্তিশালী) কোন কিছুই আমি কখনও দেখিনি'।[৩৩]

ভালবাসা ও শত্রুতার মানদণ্ড :

কাউকে ভালবাসতে হ'লে তার মানদণ্ড হ'ল ইসলামী শরী'আত। কাউকে ভালবাসার আগে আল্লাহ্র জন্য হৃদয়ের গভীরে সুদৃঢ় ভালবাসা রাখতে হবে। কিছু মানুষ এর ব্যতিক্রম করে থাকে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ 'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে আল্লাহ্র সমকক্ষ রূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার মত তাদেরকে ভালবাসে, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসায় তারা সুদৃঢ়' *(বাক্বারাহ ২/১৬৫)*। শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ভালবাসতে হবে। নতুবা কোন ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ. 'তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে সে ঈমানের স্বাদ পায়। ১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল, তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে প্রিয় হওয়া ২. শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ভালবাসা। ৩. কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত অপসন্দ করা'।[৩৪]

কোন ব্যক্তির সাথে শত্রুতা রাখার মানদণ্ড হ'ল একমাত্র মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ভালবাসতে হবে অথবা শত্রুতা রাখতে হবে। এটাই শ্রেষ্ঠতম কর্মপন্থা। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْحُبُّ فِى اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِى اللَّهِ. 'নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট শ্রেষ্ঠ আমল হ'ল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ভালবাসা এবং কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করা'।[৩৫]

শরী'আতসম্মত ভালবাসার ফলাফল :

আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসার ফযীলত হ'ল, মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও মহত্ত্বের নিমিত্তে যারা পরস্পরের মাঝে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করে, ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে তিনি তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلاَلِى الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِى ظِلِّى يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّى. 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, আমার মহত্ত্বের নিমিত্তে পরস্পর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপনকারীরা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় ছায়া দান করব। আজ এমন দিন, যেদিন আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া নেই'।[৩৬] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا فَوَ اللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ 'নিশ্চয় আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে যারা নবীও নয়, শহীদও নয়; ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হ'তে তাঁদের সম্মানজনক অবস্থান দেখে নবী এবং শহীদগণও ঈর্ষান্বিত হবেন। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদেরকে বলুন, তারা কারা? তিনি বললেন, তারা ঐ সকল লোক, যারা শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই একে

---

৩৩. ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৬২, সনদ ছহীহ।

৩৪. বুখারী হা /১৬, ২১ ও ৬৯৪১ 'ঈমান' অধ্যায়।

৩৫. আহমদ, মিশকাত হা/৫০২১।

৩৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৫০০৬।

অপরকে ভালবাসে। অথচ তাদের মধ্যে কোন রক্তের সম্পর্ক নেই, কিংবা কোন অর্থনৈতিক লেনদেনও নেই। আল্লাহ্র শপথ! নিশ্চয় তাঁদের চেহারা হবে নূরানী এবং তারা নূরের মধ্যে থাকবে। যেদিন মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে, সেই দিন তাঁদের কোন ভয় থাকবে না এবং যেদিন মানুষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবে, সে দিন তাঁদের কোন চিন্তা থাকবে না..'।[৩৭]

পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও সৌহার্দ স্থাপিত না হ'লে পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়া যায় না। শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করা যায় না। এমনকি জান্নাতও লাভ করা যাবে না। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুমিনদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও সৌহার্দ বৃদ্ধির জন্য একটি চমৎকার পন্থা বাতলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার না হবে, তোমরা ঈমানদার হ'তে পারবে না যতক্ষণ না পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও সৌহার্দ স্থাপন করবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের কথা বলব না, যা করলে তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠিত হবে? ছাহাবীগণ বললেন, নিশ্চয় হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! (তিনি বললেন) তোমাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে সালামের প্রচলন কর'।[৩৮]

রূঢ় বাস্তবতা :

সুধী পাঠক! আজ আমরা অনুকরণপ্রিয় প্রগতি ও সুশীল সমাজের তথাকথিত প্রগতিশীল মানুষ। বিজাতীয় অনৈতিক সংস্কৃতিকে বুকে আগলে ধরে নিজেদের ইযযত-সম্মান ধুলায় মিশিয়ে দিতে প্রস্তুত আমরা। অথচ একজন মুসলিম হিসাবে ঐ সকল বিজাতীয় আচার অনুষ্ঠানকে এড়িয়ে চলা সর্বাগ্রে উচিত ছিল। কিন্তু পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ তার উল্টা। ছাহাবী আবু ওয়াকেদ (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لَمَّا خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُبْحَانَ اللَّه هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى (اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ) وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 'রাসূল (ছাঃ) খায়বার যাত্রায় মূর্তিপূজকদের একটি গাছ অতিক্রম করলেন। তাদের নিকট যে গাছটির নাম ছিল 'যাতু আনওয়াত্ব'। এর উপর তীর টানিয়ে রাখা হ'ত। এ দেখে কতক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের জন্যও এমন একটি 'যাতু আনওয়াত্ব' নির্ধারণ করে দিন। রাসূল (ছাঃ) ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'সুবহানাল্লাহ, এ তো মূসা (আঃ)-এর জাতির মত কথা- 'আমাদের জন্য একজন প্রভু তৈরি করে দিন, তাদের প্রভুর ন্যায়'। আমি নিশ্চিত আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, তোমরা পূর্ববর্তীদের আচার-অনুষ্ঠানের অন্ধানুকরণ করবে'।[৩৯]

আজ আমরা যদি মুসলিম হয়ে তাদের আচার-অনুষ্ঠান পালন করি বা অনুকরণ করি তবে আমরা আর মুসলিম থাকব না, আমরা তাদের দলভুক্ত হয়ে যাব। এ মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করবে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই একজন বলে গণ্য হবে'।[৪০]

ভালবাসা হ'তে হবে জান্নাতে যাওয়ার জন্য। আর এভাবে কাজ করাই হবে প্রকৃত মুমিনের পরিচয়। অন্যান্য দিবসের মত তথাকথিত এই 'বিশ্ব ভালবাসা দিবস' পালনের মধ্য দিয়ে আমরা কি কোন উপকৃত হয়েছি? কেউ কেউ হয়তোবা হ্যাঁ জবাবকে বেছে নেবেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই মনে করেন, ভালবাসা দিবস মূলত সমাজকে অশ্লীল ও অন্যায়ের দিকে ধাবিত করছে। নৈতিক অবক্ষয় দীর্ঘায়িত হচ্ছে। অভিভাবকগণ সঠিকভাবে সন্তানকে নৈতিক শিক্ষা দিলে হয়তোবা এরকম অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির মুখোমুখী হতে হবে না।

পশ্চিমা দেশগুলো নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও অশ্লীল সংস্কৃতি চর্চার ফলে আজ তারা অসংখ্য সামাজিক সমস্যায় ভুগছে। তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার চেয়ে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক স্থাপনে বেশি আগ্রহী। ফলে তাদের পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। মেয়েরা সন্তান গ্রহণকে ঝামেলা মনে করছে। তাই পশ্চিমা দেশে আজ মানুষের জন্মের চেয়ে মৃত্যু হার বেশি। পারিবারিক ব্যবস্থা পুনর্জীবিত করার জন্য তারা বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। অতএব আমাদের ঐতিহ্যবাহী সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধন বিনষ্টকারী ও নারী-পুরুষের অবাধ সম্পর্কের শ্লোগানধারী তথাকথিত ভালবাসা দিবসের মত অপসংস্কৃতিকে আমরা গ্রহণ করতে পারি না।

উপসংহার :

অতএব আসুন! প্রথমতঃ আমরা অভিভাকগণ সচেতন হই। অতঃপর সচেতন করি আমাদের সন্তানদের। বিশ্ব ভালবাসা দিবস পালনের নামে আমাদের সন্তানকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে বাঁচাই। সতর্ক হই আমাদের পরিবার ও সমাজকে অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করতে। বিশ্ব ভালবাসা দিবসের নামে এসব ঈমান বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড হ'তে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাযত করুন। শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই যেন কাউকে ভালবাসী এবং শত্রুতাও যদি কারো সাথে রাখতে হয়, তাও যেন আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই রাখি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন-আমীন!!

[লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী]

---

৩৭. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫০১২, সনদ ছহীহ।
৩৮. মুসলিম হা/ ৯৩ 'ঈমান' অধ্যায়।
৩৯. তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪০৮, সনদ ছহীহ।
৪০. আহমাদ, আবুদাঊদ হা/৪৩৪৭, সনদ ছহীহ ।

সাতক্ষীরা যেলার কিছু মাযার ও খানকা

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(তিন) গুনাকরকাটি মাযার শরীফ :

সাতক্ষীরা আশাশুনি উপযেলার অন্তর্গত গুনাকরকাটি এলাকায় এই মাযার অবস্থিত। গুনাকরকাটি এলাকাটি ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। এর একটা ইতিহাস রয়েছে। যেটি আলো থেকে অন্ধকারের দিকে গমনের ইতিহাস। আগে ইতিহাসটি উল্লেখ করা যাক-

সাতক্ষীরার স্বনামধন্য ও প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন গাযী মাখদূম হোসাইন ওরফে 'মার্জ্জুম হোসেন'। তিনি সাতক্ষীরা যেলার সদর উপযেলাধীন ভালুকা চাঁদপুরের অধিবাসী ছিলেন। বৃটিশ ফরমানের মাধমে ব্যাপকভাবে ওয়াহ্হাবী ধরপাকড়ের হিড়িকের মধ্যেও গাযী মাখদূম হোসাইন দুর্বার সাহস নিয়ে শিয়ালকোটের এক মসজিদে রাফউল ইয়াদায়েন করে ছালাত আদায় করেছিলেন। ফলে সাথে সাথেই তিন গ্রেফতার হয়ে যান। উল্লেখ্য যে, সেযুগে ছালাতে রাফউল ইয়াদায়েন ছিল 'ওয়াহ্হাবী' ধরার জন্য একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। অতঃপর যথারীতি বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। কিন্তু অলৌকিকভাবে ফাঁসির দড়ি তিন তিনবার ছিড়ে গেলে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ভয় পেয়ে তাঁকে ছেড়ে দেন। গাযী মাখদূম হোসাইন তাঁর একমাত্র সম্বল ১২০০ গ্রাম ওযনের তামার বদনাটি নিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে একসময় সাতক্ষীরার নিজ গ্রাম ভালুকা চাঁদপুর এসে পৌঁছেন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত দিতে থাকেন। আজ সাতক্ষীরার গুনাকরকাটিতে পীরের যে আস্তানা হয়েছে, ওখানকার সমস্ত লোক এক সময় এই গাযী মাখদূম হোসাইনের ওয়ায শুনে ও কেরামতে মুগ্ধ হয়ে তাঁরই নিকটে 'আহলেহাদীছ' হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে সাতক্ষীরার আলীপুর গ্রামের মক্তবের শিক্ষক 'পীর' নামধারী জনৈক আব্দুল আযীযের প্ররোচনায় তারা পুনরায় 'হানাফী' হয়ে যায়। তবে যে বাড়ীতে ওয়ায হয়েছিল তারা সহ এখনো সেখানে মুষ্টিমেয় সংখ্যক আহলেহাদীছ আছেন ও তাদের একটি জামে মসজিদও রয়েছে *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪২১; দাওয়াত ও জিহাদ, পৃঃ ২০-২১)*।

সুধী পাঠক! গুনাকরকাটি পীরের নাম- শাহ মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয খুলনাভী। তিনি নকশাবন্দীয়া তরীকার অনুসারী ছিলেন। তার জন্ম তারিখ জানা যায়নি। তবে তিনি স্ত্রী, ৬ ছেলে ও ২ জন মেয়ে সহ অসংখ্য ভক্ত, মুরীদান ও গুণগ্রাহী রেখে ১১ই রবীউল আওয়াল মোতাবেক ২৯ আশ্বিন তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। সাতক্ষীরা যেলার দ্বিতীয় বৃহৎ মাযার হ'ল গুনাকরকাটি মাযার। সেখানে পীর ও পীরের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি সহ তার গোষ্ঠী মিলে মোট ২৯টি মাযার রয়েছে। প্রতি বছর ৩রা ফাল্গুন ১৫ই ফেব্রুয়ারী মাযারে ওরছ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যেখানে দেশী-বিদেশী বিশেষ করে ভারত, সঊদী আরব, লন্ডন সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ৮০০০ থেকে ১০০০০ ভক্ত ও মুরীদান উপস্থিত হয়। দেশ থেকে রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, যশোর, চট্টগ্রাম সহ অধিকাংশ যেলা থেকে হাযার হাযার লোক উপস্থিত হয়। ওরছ উপলক্ষ্যে সেখানে প্রায় ৪০-৫০টি গরু, ২০০-২৫০টি ছাগল যবেহ করা হয়। ২০০ মন চাউলের বিরানী রান্না করা হয়। যা ভক্ত ও মুরীদানদের মাঝে তবারক আকারে বিতরণ করা হয়। এখানেও ওরছের দিনে মীলাদ, ক্বিয়াম, পীরের জীবনী, যিকির, বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য ও কুরআন খতম হয়ে থাকে। এখানে সর্বদা দু'টি দান বাক্স রয়েছে। যেখান থেকে প্রতি মাসে প্রায় ৩০-৪০ হাযার টাকা আয় হয়ে থাকে।

গুনাকরকাটি মাযারের বর্তমান পীর শাহ মুহাম্মাদ মিন্নাতুল্লাহ। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ গদীনশীল পীরের দায়িত্ব পালন করছেন। গুনাকরকাটি পীরের খলীফা ছিলেন ৪ জন। যথা : (১) হাজী মাহবুবুর রহমান, ইনি নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বংশধর (২) মুখলেছুর রহমান (বর্মী) (৩) মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন (মুর্শিদাবাদী (৪) মাওলানা ইসলাম ছাহেব (চট্টগ্রাম)। উক্ত তথ্যগুলো মাযারের খাদেম জনাব খায়রুল ইসলামের নিকট থেকে গৃহীত। পূর্ণাঙ্গ মাযারটি তিনিই আমাদেরকে ঘুরে দেখান।

উল্লেখ্য, মাযার কেন্দ্রীক গড়ে উঠেছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। সেখানে রয়েছে হাফেযী খানা, খায়েরিয়া আযিযিয়া কামিল মাদরাসা, খায়রিয়া আযিযিয়া ফাউন্ডেশন, জামে মসজিদ প্রভৃতি।

দৃশ্যাবলী :

দৃশ্য-১ : গুনাকরকাটি মাযারে প্রবেশ করা মাত্রই একটি দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠল। ২০-২২ বছর বয়সের একটি তরুণী ফুলের কিছু পাপড়ি নিয়ে মাথা নীচু করে বসে আছে। হাত দু'টি সামনে প্রসারিত, মাথাটি মাযার সংলগ্ন উঁচু করা বারান্দার সাথে লাগানো। মেয়েটি দীর্ঘক্ষণ সেখানে কান্না-কাটি করে ও মনের আশা-নিবেদন করে চলে যায়।

দৃশ্য-২ : মাযার সংলগ্ন সম্মুখ দিকে ২০-২৫ বর্গফুটের একটি জায়গা পাকা করে রাখা হয়েছে। সেখানে কেউ জুতা পায়ে উঠতে পারে না। আমরা গিয়ে সেখানে জুতা পায়ে উঠতেই

কোথায় খাদেম লোকটি এসে আমাদেরকে বললেন যে, 'ভাই আমরা ওখানে কেউ জুতা পায়ে উঠি না। আপনারাও উঠেন না'। ফলে তার জোরাজুরিতে মাটিতে জুতা রেখেই আবার উপরে উটলাম।

দৃশ্য-৩ : গুনাকরকাটি মাযার পরিদর্শন করে যখন ফিরে আসি, তখন মূল মাযার থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে আরেকটি একক মাযার দেখলাম। যেটা সবেমাত্র শুরু হচ্ছে। আশেপাশে বনজঙ্গল। তবে একটি বাড়ী রয়েছে। সেখানে দেখলাম জনৈক এক ভক্ত দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে মন্দিরে যেমন হিন্দুরা দাঁড়িয়ে থাকে। আমাদের যেতে দেখে পার্শ্বের বাড়ী থেকে একজন লোক বেরিয়ে আসল। তাকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, এটি মূল পীরের চাচাতো ভাইয়ের মাযার। কিছুক্ষণ পর একটা অন্যরকম দৃশ্য দেখলাম। ৩০-৩২ বছরের জনৈক ব্যক্তি মাযারের নিকটে ঝোপঝাঁড় দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে গেল। ভালভাবে তাকাতে দিয়ে দেখি, তিনি সেদিকে পেশাব করছেন...।

(চার) খানকায়ে খাস মুজাদ্দেদিয়া :

সাতক্ষীরা সদর উপযেলাধীন পৌরসভার অন্তর্গত মুনজিতপুর এলাকায় 'খানকায়ে খাস মুজাদ্দেদিয়া' অবস্থিত। যা ১৯৭৮ সালে স্থাপিত হয়। এই প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। কেননা এখানে স্বয়ং পীরে কেবলার সাথে সাক্ষাৎ হয়। নেওয়া হয় তার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার। উল্লেখ্য যে, এখানে কোন মাযার নেই। সেকারণ মাযার কেন্দ্রীক যে শিরকী কার্যক্রমগুলো হয়ে থাকে সেগুলো থেকে এটা মুক্ত। যদিও মাটির নীচে প্রাণহীন মৃত পীরের চেয়ে জীবন্ত মানুষ পীরের ভক্তি-শ্রদ্ধা বহুলাংশে বেশী হয়ে থাকে। দৃশ্যতঃ হয় নানাবিধ শিরকী কর্মকাণ্ড। এখানে প্রতিবছর ২৭ শে সফর ওরছ অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ৩০০০-৪০০০ পীরের ভক্ত, মুরীদান ও সালেকগণ উপস্থিত হন। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার খানকার পক্ষ থেকেই করা হয়।

পীর ছাহেবের নাম মুহাম্মাদ আলী। জন্ম ১৯৪১ সালে। ১৯৫৭ সালে এস.এস.সি. পাশ করেন। কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৬০ সালে। তিনি সরকারের প্রধানমন্ত্রী দফতরের গোয়েন্দা বিভাগ 'ডিজিএফআই'-এর অধীনে চাকুরী করতেন। তিনি সাতক্ষীরা পৌরসভার সাবেক মেম্বার ছিলেন। দীর্ঘ ৩৫ বছর চাকুরী জীবন শেষ করে বর্তমানে তিনি অবসরপ্রাপ্ত। অত্র অঞ্চলে তিনি প্রায় ৩৭ বছর যাবত খানকা পরিচালনা করে আসছেন। সেখানে কোন মাযার নেই। তিনি নিজেই একজন স্বঘোষিত পীর। কথা হয়েছিল তার সাথে।

প্রশ্ন-১ : আপনার মৌলিক কাজ কি?

উত্তর : ক্বলব বা আত্মাকে যিন্দা করা। কেননা পবিত্র কুরআনে ১২৪টি আয়াত রয়েছে, যেখানে ক্বলবের ইছলাহ করার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন-২ : বর্তমান যারা গদীনশীল পীর রয়েছে তাদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কেমন?

উত্তর : আমার অভিমত হ'ল, তারা সকলেই ভণ্ড, প্রতারক। কারণ তাদের মৌলিক কোন শিক্ষা নেই। তিনি বলেন, আমার অনেক প্রবন্ধ ইন্টারনেটে ছাড়া হয়েছে। যেখানে এই চ্যালেঞ্জ করেছি যে, 'যে পীর ৪০ দিনের মধ্যে ক্বলবের ইছলাহ করে দিতে পারবেন, তিনিই প্রকৃত পীর। অতএব তোমরা তার কাছে গমন কর। আর যদি তা না পারে তাহ'লে সে প্রকৃত পীর নয়। বরং ভণ্ড ও প্রতারক'। তিনি বলেন, আমি প্রায় ৩৭-৩৮ বছর সমাজের মানুষের ক্বলবের ইছলাহ করে যাচ্ছি।

প্রশ্ন-৩ : আপনার খানকায়ে ভক্ত, মুরীদান ও সালেকরা এসে কি করে থাকেন?

উত্তর : ক্বলবের ইছলাহ করে। প্রতিদিন বাদ মাগরিব এখানে অত্যন্ত ভদ্র ও সহনশীলতার সাথে তারা মুরাকাবা মুশাহাদা করে থাকে। যিকির-আযকার বেশী বেশী করে। তবে কোন ওয়ায-নছীহত হয় না। তিনি আরো বলেন, আমার এই খানকায়ে যিকির উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা হয় না। বরং অনুচ্চ স্বরে করা হয়। তবে তারা নিজেদের বাড়ীতে উচ্চৈঃস্বরে যিকির-আযকার করে থাকে। আমার এখানে এসে তারা 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলে যিকির করে থাকে। কেননা অত্যন্ত ধ্যানমগ্ন হয়ে এই যিকির ৪০ দিন করলে তার ক্বলবের ইছলাহ হ'তেই হবে। তিনি আরো বলেন, ইসলামের দলীল চারটি। কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও ক্বিয়াস। কিন্তু আমি বলি, ইসলামের দলীল পাঁচটি। উপরোক্ত চারটি সহ পঞ্চমটি হ'ল প্রাকটিক্যাল। যেমন বিজ্ঞান বিষয়ের ছাত্রদের ব্যাঙ বা অন্যান্য প্রাণী কেটে প্রাকটিক্যাল শেখানো হয়ে থাকে। তেমনি ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাতের পরে ক্বলবের ইছলাহ হ'ল প্রাকটিক্যাল। যা সকলের জন্য আবশ্যক।

প্রশ্ন-৪ : 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলে যিকির করে ক্বলবের ইছলাহ হওয়ার ব্যাপারে ফলাফল পেয়েছেন কি?

উত্তর : হ্যাঁ, অবশ্যই। যারা আছেন তাদের নিকট থেকে শুনে দেখুন। উল্লেখ্য যে, যশোর যেলার মনিরামপুর থেকে ৬৫ বছর বয়সী নওশের আলী নামের একজন সালেক উপস্থিত ছিলেন। তিনিও তার পীর ছাহেবের ব্যাপারে ভাল ধারণা রাখেন। যিনি এসছেন তার ক্বলবের ইছলাহ করার জন্য।

প্রশ্ন-৫ : আপনি ক্বলবের ইছলাহের যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তো কতজনের মত মুরীদ বা সালেক রয়েছে আপনার?

উত্তর : হাযার হাযার, অসংখ্য। তবে আগে খাতায় তাদের নাম-ঠিকানা লিখে রাখতাম। কিন্তু পর্যায়ক্রমে ভক্তের সংখ্যা এতবেশী হ'তে লাগল যে, তথ্য সংগ্রহ করা আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। তবে ফুরফুরা তরীকা থেকে অনেক ভক্ত আমার

Contents

কাছে আছে। এইতো আগামী ১০ তারিখে বিমানযোগে দিল্লী যাব। সেখানে কিছু ভক্ত, মুরীদ ও সালেক রয়েছে। যদিও গুজরাট থেকে আহ্বান এসেছিল। কিন্তু আমি সেখানে যাব না। এভাবেই চলছে আমার ক্বলবের ইছলাহের কার্যক্রম।

প্রশ্ন-৬ : অন্যান্য পীরের মাযার, খানকা বা দরগায় দেখা যায় যে, সেখানে অনেক খাদেম, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি রয়েছে। এরকম কোন কিছু আপনার এখানে আছে কি-না?

উত্তর : আমার কোন নির্দিষ্ট খাদেম ও প্রতিষ্ঠান নেই। তবে প্রতিষ্ঠান করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু পারিনি।

প্রশ্ন-৭ : বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত খানকা, মাযার ও দরগা রয়েছে সেখানে মানুষ নিজের মনের আশা পূরণের জন্য মানত করে, সেজদা করে, পীরের হাত-পায়ে চুম্বন দেয় এই সমস্ত কার্যক্রমগুলো কিংবা মাযার কেন্দ্রীক যে সমস্ত শিরক-বিদ'আত হয়ে থাকে সেগুলো আপনার এখানে হয় কি-না?

উত্তর : এক কথায় না। কেননা এখানে কোন মাযার নেই। সুতরাং মাযার কেন্দ্রীক কোন শিরক-বিদ'আত এখানে সংঘটিত হয় না।

প্রশ্ন-৮ : আপনার যারা মুরীদ হয়েছে তারা কি অন্য কোন পীরের কাছে চলে যায়?

উত্তর : যায়। তবে এখানে যা পায় অন্যস্থানে তা না পেলে আবার চলে আসে কিংবা ছেড়ে দেয়। ফলে সে বিপদগামী হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমার এখানে অনেক কষ্ট আছে। কেননা অন্য পীরেরা যেমন খানবাহাদুর আহছানুল্লাহ, গুনাকরকাটি সহ অন্যান্য পীরেরা তাদের মুরীদকে বলেন যে, তোমরা বায়'আত কর, তাহ'লে পীর ছাহেব তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। কিন্তু আমি আমার মুরীদানদের বলেছি যে, আমি তোমাদের পথ বলে দিবে। কোন্ পথে গেলে তোমরা জান্নাতে যেতে পারবে। সেই পথে তোমাদের আসতে হবে। তাহ'লেই জান্নাত পাওয়া যাবে। ফলে অনেক কষ্ট হয়। তাই যারা কষ্ট করতে পারে তারা থাকে, না হয় চলে যায়।

প্রশ্ন-৯ : এই যে দেখলাম, জনৈক এক ভক্ত এসে আপনার পায়ের সামনে দুই হাঁটু গেড়ে বসে গেল। অতঃপর অতি ভক্তির সাথে দু'হাত দিয়ে আপনার পা ও পায়ের উপর-নীচ ঘষে ঘষে সেই হাত তার সমস্ত মুখে মুছল। আর আপনাকে নিয়ে বিভিন্ন রকম আধ্যাত্মিক সব কথাবার্তা বলল। এগুলো কি শিরক-বিদ'আত নয়, না-কি আপনার দৃষ্টিতে এগুলো সঠিক?

উত্তর : যেটা বৈধ সেটা করলে তো সমস্যা নেই। এটা ইসলাম স্বীকৃত পদ্ধতি। কদমবুচী করা তো জায়েয। তাছাড়া দেখার বিষয় হ'ল, সে নিজেকে স্যালেন্ডার করতে পারল কি-না? কেননা সে নিজে একজন বড় অফিসার। অতএব সে বিনয়ী ও আত্মসমর্পিত কি-না এটাই মূল দেখার বিষয়। উল্লেখ যে, বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, এই পীরের ভক্তরা তার হাত-পায়ে চুম্বন দেয়। এমনকি জিহ্বা দিয়ে পীরের হাত-পা চেটে চেটে ফয়েয নিয়ে থাকে। নাঊযুবিল্লাহ।

(পাঁচ) চম্পা মায়ের দরগা :

সাতক্ষীরা যেলার সদর থানাধীন লাবসা ইউনিয়নের কদমতলা ব্রীজের উত্তর-পশ্চিম কোণায় সাতক্ষীরা-যশোর রোডের পার্শ্বে মহিলা পীর 'চম্পা মায়ের দরগা' অবস্থিত। এটি ঠিক কত সালে অবস্থিত তা কেউ বলতে পারে না। দরগার একজন ভক্ত, স্থানীয় কবিরাজী চিকিৎসক এবং চম্পা মায়ের দরগা পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারী জনাব কাযী যাকির হোসেন বলেন, 'উক্ত মহিলা একজন সৎ এবং ইবাদত গুজার মহিলা ছিলেন। তবে তিনি যে খাছ আল্লাহ্র ওলীনি ছিলেন এটার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই'। তিনি বলেন, 'আমি বলছি তো আমার গায়ে পশম ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আসলে এ সমস্ত আল্লাহ্র ওলীদের ব্যাপারে কথা বলতে গেলে বেয়াদবী হয়ে যায়'।

অতঃপর তিনি বলেন, 'হযরত চম্পা মা এমন দ্বীনদার ও পরহেযগার মহিলা ছিলেন যে, তিনি যখন ছালাত আদায় করতেন, তখন সুন্দরবনের বাঘ রয়েল বেঙ্গল টাইগার এসে তাকে পাহাড়া দিত। তাছাড়া যার ব্যাপারে প্রফেসর মুহাম্মাদ আলী 'ব্যাঘ্রতট' শিরোনামে ৭৭৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন'। তিনি বলেন, 'প্রতি শুক্রবার এখানে ভক্তরা এসে নফল ছালাত আদায় করে, দো'আ করে, মুনাজাত করে। হাঁস, মুরগী, ছাগল ও ছাগলের দুধ সহ প্রভৃতি মানত করে থাকে। কান্না-কাটি করে। দান করে'।

সুধী পাঠক! চম্পা মায়ের দরগাটি মূলত একটি মাটির ঘর। তার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে একটি করে মাটির বারান্দা রয়েছে। ছাউনি রয়েছে টালি বা খোলা দিয়ে। ঐ ঘরের ঠিক মাঝখান বরাবর মাযারটি অবস্থিত। ঘরটি সর্বদা বন্ধই থাকে। পাশেই একটি বিরাট বটগাছ। তার নীচে ভক্তরা এসে রান্না-বান্না করে খায়। দরগা কেন্দ্রীক একটি মসজিদ রয়েছে এবং দরগাকে সামনে রেখে স্থানীয় মুসলিমরা সেখানে প্রতিবছর ঈদের জামা'আতের ছালাত আদায় করে থাকে। মহিলা পীরের মর্যাদা ও সম্মান বর্ণনা করতে গিয়ে জনাব সেক্রেটারী বলেন, 'প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা আছে, কোন একদিন জনৈক ব্যক্তি স্যান্ডেল পায় দিয়ে উক্ত ঘরের বারান্দায় ওঠে। ফলে কিছুদিন পর সে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীতে সে পূর্ণাঙ্গ পঙ্গুতে পরিণত হয়ে যায়। মুখ একদিকে বেঁকে যায়। কথা বলতে পারত না। এটাই আসলে আল্লাহ্র ওলীদের কেরামতী'।

যাইহোক, জনাব সেক্রেটারীর সাথে সাক্ষাতের পর বাইরে এসে সঙ্গী হাফীযুর রহমান ভাই বললেন, 'চলেন আজ

স্যান্ডেল পায় দিয়েই ওখানে ওঠব। দেখি কার কথা বন্ধ হয়ে যায়, কে পঙ্গু হয় আর কার মুখ বেঁকে যায়'?। অতঃপর আমরা দু'জনে স্যান্ডেল পায়ে দুই বারান্দা ঘুরে আসি। যদি ঘরের দরজা খুলা থাকত তবে ভিতরেও প্রবেশ করতাম। মূলত এটা ছিল নীরব প্রতিবাদ ও জঘন্যতম ঘৃণা প্রকাশ মাত্র।

জমজমাট ব্যবসাকেন্দ্র :

দেশে বিরাজমান মাযার, খানকা ও দরগাগুলো সবই মূলত জমজমাট ব্যবসাকেন্দ্র। এটা বিনা পূঁজির ব্যবসা। প্রচুর রোজগার। ভক্ত জনসাধারণের প্রদত্ত মানত, বখশীশ, দান-ছাদাক্বা সবই দায়িত্বপ্রাপ্ত পীর, খাদেম ও অন্যান্যদের মাঝে বণ্টন হয়ে থাকে। যদিও কোন কোন মাযারে কিছু সেবামূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তবে অধিকাংশ মাযার ও খানকায় প্রদত্ত টাকা-পয়সা, মানত করা হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল প্রভৃতি সবই মাযারের অন্তর্ভুক্ত পীর, খাদেম, মুরীদ ও সালেকদের মাঝে বণ্টন হয়। এই বণ্টন নিয়েও কোন কোন ক্ষেত্রে সহিংসতা হ'তে দেখা যায়। মাযার কেন্দ্রীক ব্যবসা খুব লাভজনক ব্যবসা। যেমন নলতা মাযারে সপ্তাহে অনুষ্ঠিত মীলাদ থেকে হাযার হাযার টাকা আয় হয়। শুধু তাবীয বিক্রয় করা হয় হাযার হাযার টাকার। তাছাড়া ঝাঁড়-ফুঁক, বরকত, ফয়েয, তবারক তো রয়েছেই। ফলে মূর্খ, অশিক্ষিত দেশের সাধারণ মুসলিম জনগণের টাকা নিয়ে গদীনশীল পীরেরা রূপকথার এক আশ্চর্যজনক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে। পীর বা খাদেমরা নামিদামী অত্যন্ত বিলাসবহুল এসি প্রাইভেট গাড়ীতে ঘুরে বেড়াই। ঢাকায় কয়েকটা করে বাড়ী, কয়েক বিঘা জমি কিনে তারা অধিকাংশ সময় মাযারে অবস্থান না করে তাদের বিলাসবহুল বাড়ীতে সময় কাটান। অন্যদিকে পীরের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া করে বিদেশের মাটিতে। কেউ আমেরিকায়, কেউ অস্ট্রেলিয়ায়, কেউ জাপান প্রভৃতি দেশে। এই তো ধর্মের লেবাসধারী তথাকথিত বুযর্গানে দ্বীন, মুক্তির কাণ্ডারী, সুফারীশের ধারক-বাহক, জান্নাতের অছীলা নামক পরিচিত পীর ও খাদেমদের আসল চেহারা, উন্মোচিত ভয়ঙ্কর রূপ, ইবলীসি প্রতারণা ও শয়তানী কুমন্ত্রণার ছলনার মুখোশ। অতএব সাবধান!

পর্যালোচনা :

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। অথচ পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও সর্বোত্তম আদর্শ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মুসলিমগণ বিভিন্ন অন্যায় কাজের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাধ্যম গ্রহণ করে থাকে। যেমন মৃত মানুষ, গরু, সূর্য, চন্দ্র, মূর্তি, দেবতা, লাশহীন পাকা কবর, খাম্বা, শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন, শহীদ মিনার, রাশিফল, গণক, জ্যোতিষী সহ নানাবিধ শিরকী মাধ্যম। অথচ তারা তাদের নিজের জন্য যেমন কিছু করার ক্ষমতা রাখে না, অনুরূপ অন্যের জন্য তো অসম্ভব। যেমন- নূহ (আঃ)-এর যুগে তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের হাতে গড়া পাঁচজন সম্মানিত মৃত ব্যক্তির মূর্তি তৈরি করেছিল এবং আল্লাহ্র রাযী-খুশি করার জন্য তাদেরকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিল। পাশাপাশি তিনি তাঁর উম্মতদেরকে রাত-দিন প্রায় দুইশ' বছর দাওয়াত দেন। কিন্তু কোন কাজে আসেনি। অবশেষে মহাপ্লাবন দিয়ে নূহের হঠকারী উম্মতকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল।

ইবরাহীম (আঃ)-এর উম্মত সূর্য, চন্দ্র, তারকা, নক্ষত্র ও মূর্তিকে পূজা করত। শিরকের শিখণ্ডীরা ছিল সদা জাগ্রত। নিজেদের হাতে গড়া মূর্তির নিকট তারা তাদের আশা-আকাংখা ও নযর-নেয়ায পেশ করত। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সবটুকু আকুতি-মিনতি ও ইবাদত মূর্তির নিকট পেশ করত। অথচ ইবরাহীম (আঃ) তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনটাই অতিবাহিত করেছেন শিরকের বিরুদ্ধে আপোসহী তাঁকে। নিজের প্রাণাধিক সন্তানকে জনমানবশূন্য বিরামহীন এক মরুভূমির নিকট রেখে আসতে কুণ্ঠাবোধ করেননি আল্লাহ্র নির্দেশের সামনে।

মূসা (আঃ)-এর গোত্র বানী ইসরাঈল নামে পরিচিত। তাদের মাঝে তিনি দীর্ঘদিন দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহ্র রহমতে ফেরআউনের কবল থেকে রক্ষাও করেছেন। কিন্তু তারাই আবার আল্লাহকে বাদ দিয়ে গরুকে তাদের প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছিল। এমনকি অসংখ্য নবীকে নির্মমভাবে হত্যাও করেছিল। কুসংস্কারে ভর্তি ছিল তৎকালীন সমাজ। তারা ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে হঠকারী, অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট জাতি।

অতঃপর বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আবির্ভাব এমন সময় হয়েছিল, তখনকার অবস্থা ছিল আরো ভয়ঙ্কর ও বিপদসঙ্কুল। বর্বরতা, বন্যতা ও কুংস্কার এত পরিমাণ ছিল যে, উক্ত যুগকে 'জাহেলিয়াতের যুগ' বলে আখ্যায়িত করা হয়। সে যুগে মানুষ আল্লাহকে প্রভু, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, মৃত্যুদাতা, জন্মদাতা, রিযিক্বদাতা প্রভৃতিতে আকুণ্ঠ বিশ্বাসী ছিল। তারা তাদের নাম আব্দুল্লাহ, আব্দুল মুত্তালিব, আব্দুর রহমান ইত্যাদি রাখত। কিন্তু এরপরেও তারা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কারণ তাওহীদে উলূহিয়্যাত বা আল্লাহ্র ইবাদত করতে তারা রাযী ছিল না। তারা নেকী অর্জন করতে চাইতো কিন্তু পাপ বর্জন করত না। অথচ নেকী অর্জন করার পূর্বশর্ত হ'ল পাপ বর্জন করা। তারা তাদের যাবতীয় আশা-আকাংখা, নযর-নেয়ায পেশ করত তাদের হাতে গড়া মূর্তির নিকটে। তারা মূর্তিপূজা ও তারকাপূজায় লিপ্ত ছিল। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সবটুকু আকুতি-মিনতি ও ইবাদত শুধুমাত্র একক মহান আল্লাহ তা'য়ালার জন্য নিবেদিত করতে হবে এই বিশ্বাসে তারা মোটেও বিশ্বাসী ছিল না। তাই তারা পৃথিবীর ইতিহাসে মুশরিক ও কাফির নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

সুধী পাঠক! বর্তমান যুগও জাহেলিয়াতের সেই কঠিন ও দুর্দশাগ্রস্ত সমাজ থেকে কোন অংশে কম দুর্দশাগ্রস্ত নয়। তারা

তাদের যাবতীয় মনের কামনা-বাসনা মূর্তির নিকট পেশ করত। আর আমরা খানকাহ, মাযার, দরগাহ ইত্যাদি স্থানে পীর বাবার নিকটে গিয়ে তার কাছ আমাদের যাবতীয় নযর-নেওয়াজ পেশ করছি। তাদের থেকে একধাপ এগিয়ে আমরা পীরের দরগাহে গিয়ে তাদের সামনে সিজদায় লুটে পড়ছি। তাদের হাতে ও পায়ে মহব্বতের চুমু দিচ্ছি। তাদের নিকট কুরবানী পর্যন্ত প্রদান করছি। জীবনের সকল ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতি সহ সব ক্ষেত্রে তাদের দো'আ ও আশীর্বাদের উপর অন্ধভাবে নির্ভর করছি। সেখানে গিয়ে পাপ মোচনের আশায় কান্না-কাটি করছি, সেজদায় মাথা নওয়াচ্ছি। অথচ ইসলামে এটা পরিষ্কার শিরক। শিরকের গুনাহ আল্লাহ কখনও ক্ষমা করেন না এবং তার চিরস্থায়ী ঠিকানা হয় জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুন।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

'নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করবে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। তবে তিনি চাইলে ইহা ব্যতীত অন্য পাপ ক্ষমা করতে পারেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করবে, সে দূরতম পথভ্রষ্ট হবে' *(নিসা ৪/১১৬ ও ৪৮)*।

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

'নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার স্থান হবে জাহান্নামে। আর এরূপ অত্যাচারীর জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثِنْتَانِ مُوْجِبَتَانِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْمُوْجِبَتَانِ قَالَ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা বলেন, দু'টি বিষয় অপরিহার্য। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! উক্ত দু'টি বিষয় কী? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি শরীক করে মারা যাবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[৪১]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ.

জাবের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[৪২]

উদাত্ত আহ্বান :

হে মুসলিম উম্মাহ! শিরক পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্যতম অপরাধ। যার বিরুদ্ধে প্রাণপন সংগ্রাম করেছেন নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) সহ সকল নবী ও রাসূল। তাঁরা শিরক ও কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে গণবিপ্লব তৈরি করেছিলেন। ফলে যাবতীয় শিরক ও শিরকের শিখণ্ডীদেরকে নসাৎ করে নির্ভেজাল তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অতএব শিরক প্রতিরোধ করতে ঐক্যবোধ্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

হে তরুণ ছাত্র সমাজ! তুমি তো বিশ্ব বিজয়ী ইসলামের অনুসারী মুসলিম। উন্নত, প্রশংসিত ও দিগ্বীজয়ী আদর্শের অনুসারী তো তুমিই। তাহ'লে তোমার শরীরে কেন আজ শিরক-বিদ'আতের দুর্গন্ধ? তুমি কেন মাযার-খানকা-দরবারের প্রতি অনুরক্ত? তুমি না ইবরাহীমের উত্তরসূরী, আলীর মত তারুণ্যদীপ্ত, হামযার মত সাহসি, মুছ'আবের মত সত্যনিষ্ঠ ও নিবেদিত প্রাণ, খালিদের মত বীরসেনানী, ওমরের মত দৃঢ়চিত্ত, খোবায়েবের মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বেলালের মত মযবুত ঈমানের অধিকারী, হানযালার মত আত্মনিবেদিত, তারেক বিন যিয়াদ ও মূসা বিন নুসায়েরের ন্যায় বীরযুদ্ধা। তুমি তো ক্লান্ত নয়, তুমি নীরব দর্শকও নয়! তাহ'লে কি তুমি ভীরু-কাপুরুষ! না-কি ইহুদী-খ্রীষ্টানদের পক্ষের শক্তি! না-কি দুনিয়াদার নেতৃবৃন্দের খোরাক!

হে আহেলহাদীছ সমাজ! অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী তো তোমরাই। তোমরাই তো শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোসহীন ভূমিকা পালন করে থাক। তোমরাই তো বিশ্ব মানবতার নিকটে হক্বপন্থী বলে স্বীকৃত। নির্ভেজাল তাওহীদ ও বিশুদ্ধ সুন্নাত তো তোমারই বক্ষে। শিরকের শিখণ্ডী ও বিদ'আতী শয়তানদের শিকড় উপড়ে ফেলা তো তোমারই দায়িত্ব। তাহ'লে আজ কেন তোমরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছ? তোমরা কি ভীতু, সন্ত্রস্ত; না-কি শক্তি ও বিবেকহীন জড় পদার্থ! অতএব আর বসে থাকার সময় নেই। সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় একক নেতৃত্বের অধীনে সংঘবদ্ধ শক্তিতে জাগ্রত হও। আসুন! সমস্ত মত-পথ-ষড়যন্ত্র-সংঘাত-হিংসা-ঈর্ষা নির্বিশেষে **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর পতাকাতলে সমবেত হয়ে শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামে নিজেদেরকে অন্তর্ভুক্ত করি। আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!!

৪১. ছহীহ মুসলিম হা/২৭৯, ১/৬৬ পৃঃ, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪২; মিশকাত হা/৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪, 'ঈমান' অধ্যায়।

৪২. ছহীহ মুসলিম হা/২৮০, ১/৬৬ পৃঃ, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪২।

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

আধুনিক যুগ : ২য় পর্যায় (খ)

জিহাদ আন্দোলন (২য় পর্যায়)

(খ) মৌলবী ফযলে এলাহী ওয়াযীরাবাদী (১৩০৪-৬৯/১৮৮৬-১৯৫১) :

মুহাম্মাদ বশীর শহীদ (রহঃ)-এর পরে ১৯৩৪ সালে মৌলবী ফযলে এলাহী দ্বিতীয়বার চামারকান্দ মুজাহিদ ঘাঁটির দায়িত্বে আসেন। মৌলবী ফযলে এলাহী ১৮ বছর বয়সে ১৯০৪ সালে আসমাস্ত কেন্দ্রে এসে আমীর আব্দুল করীম (১২৫৫-১৩৩৩/১৮৩৮-১৯১৫ খৃঃ)-এর হাতে জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করেন।[৪৩] অতঃপর আমীরের নির্দেশক্রমে তিনি হিন্দুস্থানে মুজাহিদ ও রসদ সংগ্রহের কাজে প্রেরিত হন। ১৯০৬ সালে সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে নিজেকে পুরোপুরি জিহাদের কাজে ওয়াক্ফ করে দেন। তিনি চুপচাপ হিন্দুস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। কংগ্রেস নেতা মাওলানা আবুল কালাম আযাদের (১৮৮৮-১৯৫৮) সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। সেই সুবাদে তিনি প্রথম দিকে কংগ্রেসী ছিলেন।[৪৪] কিন্তু পরে পাকিস্তান অর্জনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁরই ইশারায় অধিকাংশ আহলেহাদীছ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। তাঁরই হাতে বায়'আতকারী সরদার আবদুল কাইয়ুম আযাদ কাশ্মীরে নেতা নির্বাচিত হন।[৪৫] ১৯৪১ সালে একবার ছদ্মবেশে পুরা এক বৎসর যাবত তিনি বিহার ও বাংলা অঞ্চল ভ্রমণ করেন। আল্লামা রাগেব আহসানকে তিনি বাংলা অঞ্চলের আমীর নিয়োগ করেন।[৪৬]

জিহাদ আন্দোলনে তৎপরতার কারণে তিনি ইংরেজের গুপ্ত পুলিশের নযরে পড়েন ও ১৯১৫ সালে জলন্ধর জেলে নিক্ষিপ্ত হন। ১৯১৮ সালে পিতার মৃত্যুর পরে সংসার ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলে তিনি বাধ্য হয়ে 'ওয়াযীরাবাদ-এর বাইরে যাবেন না' এই মুচলেকায় এবং এক বছরের জন্য তিনি হাযার টাকা যামানত আদায়ের শর্তে ১৯১৮ সালে মুক্তিলাভ করেন। ১৯২০ সালের জুনের দিকে তিনি গোপনে ইয়াগিস্তান চলে যান ও আসমাস্ত মুজাহিদ কেন্দ্রে উপস্থিত হন। পরে পরিবারের সকলকে সেখানে ডাকিয়ে দেন। কিছুদিন আসমাস্ত অবস্থানের পর তিনি চামারকান্দ চলে যান। সেখানে মৌলবী আবদুল করীম-এর ইন্তিকালের পর তিনি সাময়িকভাবে চামারকন্দের 'রঈস' বা প্রধান নির্বাচিত হন। পরে আসমাস্ত কেন্দ্রের হেদায়াত মোতাবেক মৌলবী মুহাম্মাদ বশীর স্থায়ী ভাবে 'রঈস' নিযুক্ত হন। সম্ভবতঃ এই ঘটনার পর থেকে উভয়ের মধ্যে মনকষাকষির সূচনা হয়, যা শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। জীবনীকার মেহের-এর মতে এই মতবিরোধ অবশ্যই নেতৃত্বের কোন্দল ছিল না, বরং দু'জনের মধ্যে কর্মপদ্ধতিগত গরমিল ছিল।[৪৭]

মাওলানা ফযলে এলাহীর জন্য ১৯২০ সাল থেকেই কমবেশী ৩০ বৎসর যাবত হিন্দুস্থানে প্রবেশ নিষিদ্ধি ছিল।[৪৮] যদিও গোপন ছদ্মবেশে তিনি বিহার ও বাংলা এলাকায় সফর করে যান। ভারত বিভক্ত হওয়ার পরে ১৯৪৮ সালের জুলাইয়ের দিকে তিনি হিন্দুস্থানে প্রবেশ করলে গ্রেফতার হন। কিন্তু সত্বর মুক্তিলাভ করেন। এই সময়ে তিনি কাশ্মীর জিহাদে শরীক হন এবং 'জিহাদে কাশ্মীর' নামে একটি বই লেখেন।[৪৯] এইভাবে তিনি জন্মভূমি ছেড়ে কমবেশী ২৮ বৎসর সীমান্তের ইয়াগিস্তান এলাকায় জিহাদী জীবন-যাপন করেন। আমীর নে'মাতুল্লাহ্র (১৩৩৩-৩৯/১৯১৫-১৯২১ খৃঃ) পরে 'আসমাস্ত' কেন্দ্র কার্যতঃ ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলেও মৌলবী মুহাম্মাদ বশীর ও মাওলানা ফযলে এলাহীর নেতৃত্বে 'চামারকান্দ' কেন্দ্রে জিহাদর আগুন তপ্ত ছিল। ১৯৫১ সালের ৫ই মে তারিখে মুজাহিদ আন্দোলনের এই শেষ দেউটি নিভে যায় এবং তাঁরই অছিয়ত অনুযায়ী বালাকোটে সৈয়দ আহমাদ শহীদের কথিত গোরস্থানের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৫০]

১৯৪৮ সালে কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্র (১৮৭৬-১৯৪৮ খৃঃ) মৃত্যুর পরে আয়োজিত লাহোরের শোকসভায় সেনাপতি বরকতুল্লাহ মুজাহিদ নেতা হিসাবে যোগদান করেন। তখনও পর্যন্ত মাওলানা রহমাতুল্লাহ 'আমীর' হিসাবে আসমাস্ত ও চামারকান্দ উভয় কেন্দ্রের উপরে খবরদারী করতেন বলে জানা যায়।[৫১] রহমাতুল্লাহ্র মৃত্যুর সময় বরকতুল্লাহ জেলে থাকার কারণে ছোট ভাই ছিবগাতুল্লাহ 'আমীর' হন। জেল থেকে ফিরে এলে বরকতুল্লাহকে 'আমীর' নির্বাচন করা হয়। এর পর থেকে সীমান্তের কোন তৎপরতার খবর জানা যায় না।

ছাদিকপুরী পরিবার

১৮৩১ সালে বালকোট বিপর্যয়ের পর জিহাদ আন্দোলনের সার্বিক নেতৃত্ব পাটনা আযীমাবাদের ছাদিকপুরী পরিবারের উপরে পড়ে। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের যোগ্যতম নেতৃত্বে বাংলাদেশ হ'তে সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র উপমহাদেশ জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুর পরে তাঁদের উত্তরসুরীগণ জিহাদের আগুন তাজা রাখেন, সীমান্তে যা বৃটিশ রাজত্বের জন্য একটা স্থায়ী ভীতি হিসাবে বিরাজ করে। পাঁচ/সাতশ' মুজাহিদকে দমন করার জন্য বৃটিশ সরকারকে ১৮৫০ হ'তে ১৮৬৩ পর্যন্ত ১৩ বৎসর সময়কালে সর্বমোট ২০টি অভিযান প্রেরণ করতে হয়, যাতে অংশ নেয় ৬০,০০০ হাযার নিয়মিত বাহিনী।[৫২] হান্টার স্বীকার করেছেন যে, 'ভারতে আমাদের শাসক কায়েম রাখার ব্যাপারে এরা ছিল স্থায়ী বিপদের উৎস'।[৫৩] তৎকালীন পাঞ্জাব সরকার মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে প্রেরিত তাদের অভিযানের ফলাফল সম্পর্কে বলতে গিয়ে সরকারী রিপোর্টে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'এই অভিযানের মাধ্যমে হিন্দুস্থানী ধর্মান্ধদের বিতাড়িত করতেও পারিনি কিংবা আত্মসমর্পণ করে হিন্দুস্থানে তাদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬৮।
৪৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭২।
৪৫. 'সাইয়িদ বাদশাহ', পৃঃ ৪৪০।
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩২।
৪৭. 'সারগুযাস্ত', পৃঃ ৫৬৯-৭০।
৪৮. ফযলে এলাহী ওয়াযীরাবাদী, 'জিহাদে কাশ্মীর' (করাচী : জামেয়া আবুবকর আল-ইসলামিয়াহ, ২য় প্রকাশ ১৪০৮/১৯৮৮), পৃঃ ১৮, ২৮।
৪৯. 'সারগুযাস্ত', পৃঃ ৫৭২।
৫০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭২; 'সাইয়িদ বাদশাহ', পৃঃ ৪৪৮।
৫১. 'শাহযাদা বরকতুল্লাহ বক্তৃতা সংকলন', পৃঃ ১০।
৫২. হান্টার প্রণীত 'দি ইন্ডিয়ান মুলসমান্স' অনুবাদ : এম. আনিসুজ্জামান (ঢাকা : খোমরোজ কিতাবমহল, ১৯৮২), পৃঃ ১৪-১৫।
৫৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯; HISTORY OF THE FREEDOM MOVEMENT (Karachi: Pakistan historical society. 1960) Vol II, Ch. VII p. 165.

করতেও পারিনি।[৫৪] মুজাহিদগণের সংকল্পের দৃঢ়তা এবং প্রতিক্রিয়া হিসাবে সারা ভারতব্যাপী মুসলমানদের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের দিকে ইংগিত দিয়ে হান্টার বলেন, ‘আমাদের অধিকারে রয়েছে একটি চিরস্থায়ী ষড়যন্ত্র এবং সীমান্তে রয়েছে একটি স্থায়ী বিদ্রোহী শিবির’।[৫৫] মুজাহিদগণের সর্বত্যাগী জিহাদী তৎপরতার স্বীকৃতি দিয়ে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন,

‘আরব দেশের ওয়াহ্হাবীদের সঙ্গে ভারতবর্ষের (জিহাদ) আন্দোলনের কোন সম্বন্ধ ছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। কারণ সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী (১২০১-৪৬/১৭৮৬-১৮৩১) যখন ভারতে এ আন্দোলনের সূচনা করেন, তখন তিনি আরব দেশে যাননি। তাঁর দল অনেকটা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হওয়ার পর তিনি মক্কায় যান। ভারতে তিনি এক বিরাট সংঘ গড়ে তোলেন এবং তা প্রথমে শিখ ও পরে ইংরেজের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম করে, যা এই আন্দোলনের প্রধান কীর্তি। এর সাথে ওয়াহ্হাবী আকাংখা ছিল না, তা বলা যায় না, বরং এ আন্দোলনকে এক হিসাবে ব্রিটিশ রাজত্বে মুসলমানদের প্রথম মুক্তি সংগ্রাম বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।[৫৬]

উপরে বর্ণিত বিষয়টি ছিল ছাদিকপুরী পরিবারের নেতৃত্বে পরিচালিত সীমান্তে জিহাদ আন্দোলনের একটি দিক। অন্যদিকে পাটনার ছাদিকপুরী কেন্দ্র ১৮১৮ হ’তে ১৮৮৩ পর্যন্ত জিহাদে লোক ও রসদ প্রেরণের ঘাঁটি হিসাবে গোপন তৎপরতা বজায় রাখে। যদিও ১৮৬৩ সালে আম্বেলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে ছাদিকপুরী পরিবারের মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী, মাওলানা আহমাদুল্লাহ, মাওলানা আবদুর রহীম প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে আন্দামানে নির্বাসন দেওয়া হয়। মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী আন্দামানের ‘রস’ (Ross island) দ্বীপে ১৮৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী এবং তাঁর বড় ভাই মাওলানা আহমাদুল্লাহ ‘ভাইপার’ (Viper island) দ্বীপে ১৮৮১ সালের ২১শে নভেম্বর তারিখে অবর্ণনীয় কষ্ট ও নির্যাতনের মধ্য দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বেলায়েত আলীর ভাতীজা মাওলানা আবদুর রহীম বিন ফারহাত হুসাইন দীর্ঘ প্রায় বিশ বছর পরে মুক্তি পেয়ে ১৮৮৩ সালের মার্চে পাটনায় ফিরে আসেন। কিন্তু সেখানে তখন তাঁর ঐতিহাসিক জমিদার পরিবারের বাস্তুভিটার চিহ্ন খুঁজে পাওয়ার মত অবস্থা পর্যন্ত ছিল না। তাঁর পরিবার তখন ‘নান্মূহিয়া’ (ننموهيه) মহল্লাতে থাকেন। তিনি সেখানে শেষ জীবনের দুঃখময় দিনগুলি কাটান এবং ছাদিকপুরী পরিবারের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দলীল ‘আদ-দুররুল মানছূর’ ওরফে ‘তায্কেরায়ে ছাদেক্বাহ’ রচনা করেন। ১৩৪১/১৯২৩ সালের ২৫শে জুলাই ৯২ বছর বয়সে তিনি সেখানে ইন্তেকাল করেন।[৫৭]

১৮৬৪ সালে বৃটিশ সরকার ছাদিকপুরী পরিবারের উপরে এক আকস্মিক অভিযান চালিয়ে নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার, তাদের সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত করা ছাড়াও সমস্ত ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ভিটা উচ্ছেদ করে সেখানে লাঙল চালানো হয়। মাওলানা ফারহাত হুসাইনসহ ছাদিকপুরী পরিবারের বুযুর্গ ব্যক্তিদের কবরস্থান সমান করে সেখানে হিন্দু হরিজনদের শুকর পোষার আখড়া এবং শহরের পায়খানা ফেলার গাড়ী রাখার জায়গা বানানো হয়। কিছু অংশে মহিলাদের মীনাবাজার বসানো হয়। বাকী অংশে মিউনিসিপ্যালিটির বিল্ডিংসমূহ নির্মিত হয়েছে।[৫৮] অথচ এখানেই একদিন সারা ভারতের মুক্তির জন্য জিহাদের পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ হ’ত। জান্নাতের মজলিস সমূহ সদা গুলজার থাক্ত। যাদের রেখে যাওয়া জিহাদের খুনরাঙা পথ ধরে আসে ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহ ও ১৯৪৭-এর ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন।

কিন্তু এত বড় ধ্বংসযজ্ঞ সত্ত্বেও ছাদিকপুর কেন্দ্রে জিহাদের আগুন নিভেনি। মাওলানা আবদুর রহীম যখন ১৮৬৪ সালে গ্রেফতার হন তখন তাঁর ১৭ বৎসর বয়স্ক চাচাতো ভাই মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান যাবীহ (মৃঃ ১৩০৭ হিঃ) বিন মাওলানা বেলায়েত আলী ইমারতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি পরিবর্তিত অবস্থা বিবেচনা করে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি এই ঐতিহাসিক জিহাদ কেন্দ্রকে শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করেন। ১৮৮৪ সালে তিনি সেখানে ‘মোহামেডান এ্যাংলো এরাবিক স্কুল’ খোলেন এবং ‘ইনষ্টিটিউট’ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন।[৫৯]

পরবর্তীতে মাওলানা আহমাদুল্লাহর পৌত্র মাওলানা আবদুল খবীর বিন মাওলানা আবদুল হাকীম ১৯৭৩ সালের ৩রা নভেম্বর তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত জামা‘আতে আহলেহাদীছের ‘আমীর’ ছিলেন। তিনি উঁচুদরের আলিম ও মুত্তাক্বী ছিলেন। তিনি এতই জনপ্রিয় ছিলেন যে, জানাযায় উপস্থিত লোকসংখ্যা স্মরণকালে অতুলনীয় ছিল।[৬০] মাওলানা আবদুল খাবীর-এর পুত্র মাওলনা আবদুস সামী‘ বর্তমানে ‘আমীরে জামা‘আত’ হিসাবে পাটনার এই ঐতিহাসিক জিহাদী পরিবারের ঐতিহ্য আগ্লে আছেন (ঠিকানা : দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, পাটনা-৭, বিহার, ভারত)।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, পাক-ভারত উপমহাদেশকে গোলামীর শৃংখল হ’তে মুক্ত করার জন্য এবং একই সাথে কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক নির্ভেজাল ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য দিল্লীর অলিউল্লাহ পরিবার ও তাঁর পরে পাটনার ছাদিকপুরী পরিবারের যে অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে, ভারতবর্ষে তার কোন তুলনা নেই। জিহাদ আন্দোলন ও আহলেহাদীছ আন্দোলন একই সাথে চলতে গিয়ে একদিকে বৃটিশ শাসনশক্তির নিষ্ঠুরতম আচরণ, জেল-যুলুম, ফাঁসি, সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, আন্দামান ও কালাপানির লোমহর্ষক নির্যাতন, অপরদিকে প্রতিবেশী ঈর্ষাকাতর আলিমদের ও তাদের অন্ধ অনুসারীদের প্রদত্ত অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও ভূমিকম্পসদৃশ মুছীবতসমূহ হাসিমুখে বরণ করে নেওয়ার মাধ্যমে ছাদিকপুরী পরিবার যে অনন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছে, তা ভবিষ্যতের যে কোন আদর্শবাদী মুজাহিদের জন্য স্থায়ী প্রেরণার উৎস হ’য়ে থাকবে। *(ক্রমশঃ)*

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (পিএইচ.ডি থিসিস) শীর্ষক গ্রন্থ পৃঃ ৩১১-৩১৫]

৫৪. হান্টার, পৃঃ ৩১।

৫৫. আবদুল মওদূদ, ‘ওহাবী আন্দোলন’ (ঢাকা : আহমাদ পাবলিশিং হাউস, ৩য় সংস্করণ, বাং ১৩৯২/১৯৮৫ খৃঃ), পৃঃ ১০২।

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৭। মন্টগোমারী ওয়াট ‘১৮২৩ সালে হজ্জের সফরে সাইয়িদ আহমাদ ওয়াহ্হাবী সংস্পর্শে আসেন’ বলে যে মন্তব্য করেছেন তা ঠিক নয়। ISLAMIC PHILOSOPHY AND THEOLOGY (Edinburgh University Press, 1962) p. 165.

৫৭. কাইয়ূম খিযির প্রণীত ‘ছাদিকপুর-পাটনা, কুরবানগাহে আযাদীহে ওয়াত্বন’ (পাটনা, বিহার লিথো প্রেস, ১৯৭৯ ইং), পৃঃ ৩৭, ৩৮, ৩৯; জা‘ফর থানেশ্বরী, ‘তাওয়ারীখে আজীব’ (দিল্লী : মুস্তানছির প্রেস, ১৩৪৪/১৯২৫), পৃঃ ৪৪-৪৫, ৬৬, ৮১।

৫৮. ‘কুরবানগাহ’, পৃঃ ৩৬।

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২-২৩।

৬০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূলনীতি

-আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ)

আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূলনীতি

হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১৭০৩-১৭৬৫) **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'**-এর যে কতিপয় বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীয় বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ **'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'**য় ব্যক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে দুইটি মূলনীতি সমধিক উল্লেখযোগ্য।

إذا لم يجدوا في كتاب الله أخذوا بسنة رسول الله صلي الله عليه و سلم سواء كان مستفيضا دائربين الفقهاء أو يكون مختصا بأهل بلد او أهل بيت او بطروق خاصة وسواء عمل به الصحابه او الفقهاء او لم يعملوا به.

'প্রথম, কোন সমস্যার সমাধান পবিত্র কুরআনে না মিলিলে আহলেহাদীছগণ প্রমাণ ও সমাধানরূপে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সে হাদীছ বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রচলিত থাকুক অথবা নির্দিষ্ট কোন নগর বা পরিবারের ভিতর উহা সীমাবদ্ধ থাকুক, উহা বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হউক অথবা মাত্র একটি সনদের ভিতর উহা নির্ধারিত থাকুক, সে হাদীছের উপর ছাহাবী ও ইমামগণ আমল করিয়া থাকুন বা না করিয়া থাকুন, সকল অবস্থায় আহলেহাদীছগণের নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ হাদীছ অগ্রগণ্য হইয়া থাকে'।

দ্বিতীয় মূলনীতি সম্বন্ধে শাহ ছাহেব লিখিয়াছেন যে,

متي كان في المسئلة حديث فلا يتبع خلافه أثر من الأثار ولا إجتهاد أحد من المجتهدين.

'যে প্রশ্নের সমাধান রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছে পাওয়া যাইবে, তাহার বিরুদ্ধে কোন ছাহাবী, তাবেয়ী, ইমাম ও মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত আহলেহাদীছগণ গ্রাহ্য করিবেন না' *(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, পৃঃ ১৫৩)*।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর বৈশিষ্ট্য বলিয়া উল্লিখিত হ'লেও হাদীছের এই সার্বভৌমত্ব মুসলিমগণের কোন দল আদর্শগত ভাবে কখনও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। আহলেহাদীছগণের ন্যায় আহলে সুন্নাতের অন্যান্য স্কুলগুলিও কুরআনের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছকেই প্রামাণিকতার অপরিহার্য উপাদান বলিয়া সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বলিয়া সমষ্টিগত ভাবে তাঁহারা সকলেই 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু হাদীছের প্রামাণিকতাকে মানিয়া লওয়া ও উহাকে অগ্রগণ্য করা এক কথা নয়। পক্ষান্তরে শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছের প্রদত্ত বিবরণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে, হাদীছ গ্রহণ ও অনুসরণ করিবার যে সূত্র আহলেহাদীছগণের অবলম্বনীয়, তাহা অন্যান্য দলের অনুসরণীয় নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শাফেয়ীগণ নীতিগতভাবে হাদীছকেই কুরআনের পর অগ্রগণ্য করিয়া থাকেন কিন্তু যে সকল হাদীছ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) কর্তৃক অথবা তাঁহার ফিকহে পরিগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি ছাড়া তাঁহারা ইমাম আবু হানীফা কর্তৃক পরিগৃহীত অথবা তাঁহার ফিক্‌হে অবলম্বিত হাদীছসমূহের দিকে দৃকপাত করা আদৌ আবশ্যক মনে করেন না। এ রীতি হানাফী স্কুলের বেলাতেও তুল্য ভাবে প্রযোজ্য। শুধু মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের স্কুলগুলিতেই এ ব্যাপারে সীমাবদ্ধ রহে নাই, পক্ষান্তরে উত্তরকালে ফিকহের চতুঃসীমাকে উল্লংঘন করিয়া এ রীতি দর্শন ও তাছাউওফের ময়দানও চড়াও করিয়া ফেলিয়াছে। প্রত্যেক দার্শনিক, ছূফী ও পীর, মারেফত, তাছাউওফ এবং কালাম ও ফালসাফার নামে যাহাই বলুন আর যাহাই করুন না কেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ কর্তৃক সে উক্তিও আচরণ সমর্থিত হইয়াছে কি-না, তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলীরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করাও আবশ্যক মনে করেন না।

তাঁহারা ভক্তির আতিশয্যে ইহা ধরিয়া লইয়াছেন যে, তাঁহাদের গুরুগণের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের অন্যাথাচরণ করা সম্ভবপর নয় এবং তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন বা করিয়াছেন, তাহার পিছনে কোন না কোন হাদীছ অবশ্যই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার ফলস্বরূপ মুসলিমগণের জাতীয় সংহতি বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহারা শত শত দলে, মতে ও পথে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, আর আজ কোন্ কোন্ রীতি ও আচরণ ইসলামী, আর কোন্‌গুলি সত্যিকারভাবে অনৈসলামিক, তাহা নির্দেশিত করা দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ফল ফলিয়াছে এই যে, এই আচরণের দরুণ আজ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সার্বভৌমত্ব অবলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদেশ প্রতিপালন করার কার্য মাওলানা, পীর, দরবেশ, ইমাম ও মুজতাহিদগণের অনুমতিসাপেক্ষ হওয়ায় আদেশের মৌলিক অধিকার আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবর্তে উম্মতের কতিপয় অভিজাত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরিত এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইমামত ও অধিনায়কত্ব তাঁহাদের অধীনস্থ হইয়া পড়িতেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সর্বময় কর্তৃত্বের স্বীকৃতি এবং তাঁহার সান্নিধ্য লাভের সাধনাই মুসলিমজাতির একমাত্র কাম্য ও বরেণ্য হওয়া উচিত।

به مصطفي برسان خويش را كه دين هم اوست
اگر باو نرسيدى تمام بو لهبي است.

অর্থাৎ 'তুমি নিজেকে টানিয়া লইয়া মুছত্বফার সান্নিধ্যে উপস্থিত কর, কারণ দ্বীনের সমস্তটাই তিনি। তাঁর দরবারে পৌঁছতে যদি না পার, তাহা হইলে সমস্তই আবু লহবীতে পর্যবসিত হইবে'-ইক্ববাল।

বিশ্ববরেণ্য সাধক তাপসমণ্ডলী, যাঁহারা জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে সুবর্ণরঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং যাঁহাদের সাধনা জাতীয় সম্পদের শ্রেষ্ঠতম অবদান বলিয়া কীর্তিত হইয়া

থাকে, অন্তর ও বহির্জগতে কুরআন ও হাদীছের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁহারা যে অমূল্য নির্দেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন বক্ষমান সন্দর্ভে তাহার কতকাংশ প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দেওয়া হইতেছে।

(১) দ্বিতীয় শতকের বিখ্যাত সাধক ও ফক্বীহ সুফিয়ান ছাওরীর (১৬ হিজরী) অভিমত ইমাম ইবনে জাওযী স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন,

(١) ولا يقبل قول الابعمل ولا يستقيم قول و عمل الا بنية ولا يستقيم قول و عمل ونية إلا بحوا فقه السنة.

'কোন উক্তি কার্যে পরিণত না করা পর্যন্ত গ্রাহ্য হয় না, আবার উক্তি ও আচরণ সংকল্পের বিশুদ্ধতা ছাড়া সঠিক হইতে পারে না; পুনশ্চ উক্তি, আচরণ ও সংকল্পের বিশুদ্ধতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শের অনুরূপ না হওয়া পর্যন্ত সঠিক হইবে না' *(তালবীসে ইবলীস, পৃঃ ১)*।

(২) শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়হ আব্দুল হারামাইন ফুযায়ল বিন আয়াযের (মৃত ১৮৭ হিজরী) উক্তি স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন,

(٢) إن العمل إذا كان خالصا و لم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا و لم يكن خالصا لم يقبل حتي يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله وحده والصواب أن يكون علي السنة.

'আচরণ যদি বিশুদ্ধ হয় কিন্তু যথাযথ না হয়, তাহা হইলে উহা গ্রাহ্য হইবে না, আবার যদি যথাযথ হয় কিন্তু বিশুদ্ধ না হয়, তথাপিও উহা গ্রাহ্য হইবে না। ফলকথা যুগপৎভাবে বিশুদ্ধ এবং যথাযথ না হওয়া পর্যন্ত আচরণের কোন মূল্যই নাই। আচরণের 'বিশুদ্ধতার' তাৎপর্য এই যে, উহা শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সমাধা করিতে হইবে আর 'যথাযথ' হওয়ার অর্থ এই যে, আচরণটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুসারে সম্পন্ন করিতে হইবে' *(মিনহাজুস সুন্নাহ ৩/৬৩ পৃঃ)*।

(৩) আবদুল গণী, নাবালুসী ও সুয়ূত্বী স্ব স্ব গ্রন্থে ইমাম আবু সুলায়মান আবদুর রহমান বিন আতীয়াহ দারানীর (মৃত ২১৫ হিজরী) উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন,

(٣) ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم ايام فلا أقبل منه الا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة.

'মাঝে মাঝে উপর্যুপরি আমার মনে ছূফীদের গুপ্ত রহস্যমূলক কথা উদিত হইতে থাকে কিন্তু কুরআন ও হাদীছরূপী দুই বিশ্বস্ত সাক্ষী কর্তৃক উক্ত কথা সমর্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমি উহার প্রতি দৃকপাত করি না' *(নাবালুসী, হাদীকাতু মনদীয়াহ ১/১২৬ পৃঃ; সুয়ূত্বী, মিফতাহুল জান্নাহ, পৃঃ ৪৯)*।

(৪) ইমাম দারানীর অন্যতম শিষ্য দামেস্কের সাধক শায়খ আবুল হুসাইন আহমাদ বিন আবিল হাওয়ারী (২৩০ হিঃ) সম্বন্ধে সাইয়েদুত তাইয়েফা অর্থাৎ তরীকত পন্থীগণের মহান নেতা শায়খ জুনায়েদ বাগদাদী বলিতেন, আহমাদ বিন আবিল হাওয়ারী শাম দেশের সুবাসিত গুল্ম (ريحانة الشام)। সুয়ূত্বী এই আহমাদ বিন আবিল হাওয়ারীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন,

(٤) ما عمل عملا بلا إتباع سنة رسول الله صلي الله عليه و سلم فباطل عمله.

'যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ ব্যতিরেকে কোন সৎকার্য সম্পাদন করিবে তাহার সেই সৎকার্য বাতিল' *(মিফতাহুল জান্নাত, পৃঃ ৪১)*।

(৫) ইয়াফেয়ী নাবালুসী কুশায়রী প্রভৃতি মিসরের বিখ্যাত তাপস যুন্নুম আবুল ফয়েযের (মৃত ২৪৫ হিঃ) উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন,

(٥) ومن علامات المحبة الله تعالي : متابعة حبيب الله محمد عليه الصلوة والسلام في أخلاقه وأفعاله و اوامره وسننه.

'আল্লাহ্র জন্য যে যে অনুরাগ, তাহার লক্ষণ হইতেছে চরিত্রে, আচরণে, আদর্শে ও রীতিনীতিতে সর্বতোভাবে আল্লাহ্র হাবীব মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করিয়া চলা' *(ইয়াফেয়ী, মির'আতুল ২/১৫ পৃঃ; হাকীকা ১/১২৬ পৃঃ; কুশায়রী, রিসালা, পৃঃ ৮)*।

(৬) নছর আবাদীর সহচর নেশাপুরের প্রথিতযশা সাধক শায়খ আবু হাফস ওমর বিন সালিম কবীর হাদ্দদ (মৃত ৬৫) বলিতেছেন,

(٦) من لم يزن أفعاله واحواله في كل وقت بالكتاب والسنة و لم يتهم خواطره فلا تعدوه في ديوان الرجال.

'যে ব্যক্তি স্বীয় উক্তি ও অবস্থা কুরআন ও সুন্নাহ্র মানদণ্ডদ্বয়ে ওযন করিয়া দেখে না এবং তাহার মানসপটে যে সকল ধারণা উদিত হয়, তাহা ভ্রমাত্মক হইতে পারে, এ আশংকা পোষণ করে না, তাহাকে মনুষ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণনা করিও না' *(ইমাম শাত্বেবী, ই'তেছাম ১/১২৭ পৃঃ; মির'আত ২/১৭১ পৃঃ; মিফতাহুল জান্নাহ, ৪৯ পৃঃ)*।

(৭) শায়খ শিহাবুদ্দীন সাহরাওয়ার্দী স্বনামধন্য গুরু সাহল বিন আবদুল্লাহ তুসতরীর (মৃত ২৮৩ হিঃ) উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে,

(٧) كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة باطل.

'সর্ববিধ দশা প্রাপ্তি (অনুরাগের উম্মত্ততা) যাহার সাক্ষ্য কুরআন ও হাদীছ প্রদান করে না, তাহা বাতিল' *(আওয়ারিফুল মা'আরিফ ১/২৮০ পৃঃ)*।

সাহল তুসতরীর আর একটি উক্তি ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) এবং কুশায়রীও বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন-

كل عمل بلا إقتداء فهو عيش النفس وكل عمل بإقتداء فهو عذاب علي النفس.

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শবিহীন সমুদয় আচরণ প্রবৃত্তির বিলাসিতা মাত্র আর আদর্শের অনুসরণে অনুষ্ঠিত আচরণ প্রবৃত্তির জন্য দণ্ড স্বরূপ' *(মিনহাজ ৩/৮৪ পৃঃ; কুশায়রী, পৃঃ ১৫ ও ১৯) (চলবে)*

[দ্রষ্টব্য : আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী প্রণীত 'আহলেহাদীছ পরিচিতি' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃঃ ১৩৬-১৪৩]

জাতিসংঘ মানবাধিকার ও ইসলাম

বিবাহের অধিকার : প্রসঙ্গ বহু বিবাহ

-শামসুল আলম

(২য় কিস্তি)

অন্য ধর্ম ও মতে বহু বিবাহ :

প্রগতিবাদীগণ ইসলামে বহু বিবাহ বা স্ত্রী গ্রহণকে নিয়ে চরম কটাক্ষ করেন। কিন্তু তারা জানেন না যে একজন পুরুষের জন্য কখন, তার একাধিক স্ত্রীর প্রয়োজন পড়ে। সেটা পুরুষের বার্ধক্য, অসুস্থতা, জৈবিক চাহিদা, পারিবারিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক অথবা মানবীয় যে কোন কারণে প্রয়োজন পড়তে পারে। আর সে জন্য পৃথিবীতে প্রায় সকল ধর্ম বিশেষজ্ঞ অথবা পণ্ডিত ও দার্শনিকগণও বহু বিবাহকে বরং বহু পূর্বে অথবা পরে মেনে নিয়েছেন বলে বুঝা যায়। নিম্ন বর্ণিত আলোচনা থেকে বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হবে।

যুগে যুগে ইতিহাসে বিভিন্ন ধর্ম-মত ও মনীষীগণ বহু বিবাহের ধারণা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, প্রাচীন কাল থেকে প্রায় সকল জাতি ও সভ্যতায় বহু বিবাহের প্রথা চালু হয়ে আসছে। আসিরীয়, চীনা, ভারতীয়, বেবিলনীয়, অসুরীর ও মিশরীয় সভ্যতায় বহু স্ত্রী গ্রহণ ছিল একটি সাধারণ রেওয়াজ। এদের অধিকাংশের মধ্যে আবার স্ত্রীদের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। যেমন চীনের 'লীকী' ধর্ম একজন পুরুষকে একসঙ্গে একশ' ত্রিশজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছিল। আর চীনের বড় বড় বাবু লোকদের তো তিন হাযার পর্যন্ত স্ত্রী ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহুদী ধর্মশাস্ত্রে সীমা-সংখ্যাহীন স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি রয়েছে। খৃষ্ট ধর্মে বহু স্ত্রী গ্রহণের কোন নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ নেই। ইনজিল কিতাবে বহু বিবাহ নিষেধ করে কোন স্ত্রোস্তে বলা হয়নি। বরং পলিশ-এর কোন কোন পুস্তিকায় এমন ধরণের কথা রয়েছে, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ সঙ্গত। প্রাচীনকালের অনেক খৃষ্টান ছিল, যারা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছিল একই সময়ে। অধিকাংশ গির্জার পাদ্রীদের বহু সংখ্যক স্ত্রী ছিল। আর বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বহু সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ সঙ্গত বলেও খৃষ্ট যুগের বহু পন্ডিত ফাতাওয়া দিয়েছেন।

পারিবারিক ইতিহাস বিশেষজ্ঞ Wester Mark বলেছেন, 'গির্জার অনুমতিক্রমে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের রেওয়াজ সপ্তদশ শতক পর্যন্ত চলেছে। আর অনেক অবস্থায় গির্জা ও রাষ্ট্রের হিসাবের চাইতে তার সংখ্যা অনেক গুণ বেড়ে যেত'।

তাঁর গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে, আয়ারল্যান্ড সম্রাটের দু'জন স্ত্রী ছিল, দু'টি ছিল দাসী। শালিমাম্যনেরও দু'জন স্ত্রী ও বহু সংখ্যক দাসী ছিল। তাঁর রচিত আইন থেকে প্রকাশ পায় যে, তাঁর যুগের লোকদের মধ্যে বহু বিবাহ কিছু মাত্র অপরিচিত ব্যাপার ছিল না।

মার্টিন লুথারও বহু বিবাহের যৌক্তিকতা অস্বীকার করতে পারেননি। কেননা তাঁর মতে ত্বালাক্ব অপেক্ষা একাধিক স্ত্রী রাখা উত্তম। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ভিষ্টা ভিলিয়ার[৬১] এক প্রস্তাবের মাধ্যমে একজন পুরুষের জন্য দু'জন করে স্ত্রী গ্রহণ জায়েয করে দেয়া হয়। খৃষ্টানদের কোন কোন শাখার লোকেরা বরং মনে করে যে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ একান্তই কর্তব্য। ১৫৩১ সনের একটি ঘোষণায় সুস্পষ্ট করে বলা হয় যে, সত্যিকার খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী অবশ্যই বহুসংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ করতে হবে। প্রট্যাস্ট্যান্টদের (খৃষ্টানদের এক শাখা) ধারণা ছিল, বহু সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ এক পবিত্র আল্লাহরই ব্যবস্থা।[৬২]

আফ্রিকার কালো আদমীদের মধ্য থেকে যারা খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করত তারা সকলে বহু স্ত্রী গ্রহণে অভ্যস্ত ছিল। গির্জার পাদ্রীরা চিন্তা করল এদের যদি বহু বিবাহ প্রথা এই মুহূর্তে বন্ধ করি তাহ'লে তাদের খৃষ্ট ধর্ম প্রচারে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এজন্য বহু বিবাহ প্রথা বন্ধ করা হয়নি।

১৯৫৪ সালে ২য় বিশ্বযুদ্ধের লাখ লাখ স্ত্রী-বিধবা হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে আলমানিয়ার মিউনিখে অনুষ্ঠিত এক বিশ্ব যুব সম্মেলনে বলা হয়, এখানে পুরুষদের তুলনায় নারীর সংখ্যা ব্যাপক বেশী। অসহায় নারীদের জন্য কি করা যায়, তখন সম্মেলনে উপস্থিত সঊদী যুবকদের প্রস্তাব অনুযায়ী একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; যা আলমানিয়ার শাসনতন্ত্রে ধারা সংযোজন করার প্রস্তাব ওঠে। এরপর আলমানিয়া থেকে এক প্রতিনিধি দল মিশরের জামে আযহারে আগমন করেন, ইসলামে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিধান সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে। বিশ্ব আলোচিত ব্যক্তি হিটলারও চেয়েছিলেন তাঁর দেশে (জার্মানিতে) একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতির আইন চালু করতে; কিন্তু মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণে আর সম্ভব হয়ে উঠেনি।

প্রখ্যাত খৃষ্টান (আলমানিয়া) দার্শনিক শোপেন আওয়ার লিখেছেন, পুরুষ ও স্ত্রী সমান মর্যাদার কারণে ইউরোপে বিবাহ সংক্রান্ত আইন অত্যন্ত খারাপ। আমাদেরকে একজন স্ত্রী গ্রহণে বাধ্য করেছে; যার ফলে আমাদের অর্ধেক

---

৬১. ১৬১৮ সন জার্মানীর বিভিন্ন দেশীয় রাজা ও নওয়াব সামন্তদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং মধ্য ইউরোপের লোকদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং তা ক্রমাগত ভাবে ত্রিশ বছর পর্যন্ত এক আত্মঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত রাখা হয়। ১৬৬৮ সনে এ যুদ্ধ খুব কষ্টের সঙ্গে বন্ধ করানো হয় এবং পরস্পরে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার ফলে এক সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাই ইহাকে 'ভিস্টা ফিলিয়া সন্ধি' নামে আভহিত করা হয়।

৬২. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃঃ ২৩০।

অধিকারই নষ্ট হয়ে গেছে। অথচ আমাদের দায়িত্ব বহু গুণে বেড়ে গেছে। কাজেই যতদিন পর্যন্ত মেয়েদেরকে পুরুষের সমান অধিকার দেয়া হবে, ততদিন তাদেরকে পুরুষদের মত বুদ্ধিও দেয়া উচিত। আমরা যখন মূল বিষয়ে চিন্তা করি, তখন এমন কোন কারণ খুঁজে পাই না, যার দরুন পুরুষকে এক স্ত্রীর বর্তমানে দ্বিতীয়াকে গ্রহণ করতে দেয়া যুক্তিসংগত হতে পারে। বিশেষত কারো স্ত্রী যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে কিংবা বন্ধ্যা হয় অথবা কয়েক বছরের দাম্পত্য জীবনের পরই বৃদ্ধা হয়ে যায়, তখন সেই পুরুষকে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণে কি করে বাধা দেয়া যেতে পারে। মোরমোর প্যারাইবো খৃষ্টানরা এক স্ত্রী গ্রহণের রীতি বাতিল না করে কোন কল্যাণই লাভ করতে পারে না। প্রাক ভারতের প্রাচীন ইতিহাসেও দেখা যায়, রাজা-মহারাজা ও সম্রাট-বাদশাহদের ছাড়াও অলী-দরবেশ ও মুনি-ঋষিরা পর্যন্ত একাধিক স্ত্রী গ্রহণে অভ্যস্ত ছিলেন। রামচন্দ্রের পিতা মহারাজা দাশরথের তিনজন স্ত্রী ছিল পিটরাণী, কৌশল্য ও রাণী সুমিত্রা। যে শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বা স্বয়ং ভগবান বলে ধারণা করা হয়, তাঁরও ছিল অসংখ্য স্ত্রী। লাল লজপতি রায় কৃষ্ণ চরিত্রে তাঁর আঠার জন স্ত্রী ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। রাজা পান্ডেরোরও ছিল দুই স্ত্রী কুন্তি আর মাভরী।[৬৩]

উক্ত আলোচনা থেকে এ কথায় স্পষ্ট যে, যুগে যুগে একজন পুরুষের জন্য একাধিক নারী বা স্ত্রীর প্রয়োজনীয়তা মানব সমাজে সুষ্ঠু, সুন্দর ও পরিমার্জিত করার স্বার্থেই প্রয়োজন ছিল, যেটা ইসলাম বাস্তবপোযোগী পদ্ধতিতে তুলে ধরেছে।

ইসলামে বহু বিবাহ :

পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলার মাধ্যমে মানব সভ্যতা তথা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একজন মানুষের (পুরুষের) জন্য কখনও কখনও একাধিক বিবাহের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যা কি-না মহান দূরদর্শী, জ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত মানবতার মুক্তির দিশারী মুহাম্মাদ (ছাঃ) কর্তৃক আনিত ও স্বীকৃত। উল্লেখ্য রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য চারের অধিক স্ত্রী আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত থাকলেও তাঁর উম্মতের জন্য সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী একত্রে রাখতে পারবে বলে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

'আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীমদের (মেয়েদের) প্রতি সুবিচার করতে পারবে না। তবে নারীগণের মধ্য হ'তে তোমাদের মনমত দু'টি ও তিনটি ও চারটিকে বিয়ে কর; কিন্তু যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তবে মাত্র একটি অথবা তোমাদের দক্ষিণ হাত অধিকারী, (কৃতদাসী) এটা অবিচার না করার নিকটবর্তী' *(নিসা ৪/৩)*। অর্থাৎ উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, একজন মুসলিম একত্রে এক থেকে সর্বোচ্চ চারটি বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু শর্ত যে, তার দৈহিক ও অর্থনৈতিক সামর্থ্য থাকতে হবে এবং তা ইনছাফপূর্ণ হ'তে হবে। কাউকে কোন বিষয়ে কম-বেশী করা যাবে না। কারণ ক্বিয়ামতের ময়দানে এর জন্য হিসাব দিতে হবে।

প্রশ্ন হ'ল- ইসলাম কেন বহু বিবাহ অর্থাৎ চারটি বিয়ে করার অনুমতি দিল? সংক্ষেপে এর উত্তর এই যে, সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে দেখা যায় একাধিক বিয়ে প্রায় সবক্ষেত্রে উপযুক্ত, বাস্তবসম্মত ও কার্যকরী। তবে প্রথমে যদি বলতে হয় পৃথিবীতে কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ, যেখানে বলা হয়েছে, 'একজনকে বিয়ে কর'। অন্য এমন কোন ধর্মগ্রন্থ নেই যাতে বলা আছে, 'কেবল একজনকে বিয়ে কর'। গীতা, বেদ, রামায়ন, মহাভারত, বাইবেলে কোথাও বলা হয়নি যে, কেবল একজনকে বিয়ে কর। বরং শুধুমাত্র কুরআনেই এর সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। অন্যত্র হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ সমূহে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ রাজাদেরই একাধিক স্ত্রী ছিল। রাজা দশরথ, কৃষ্ণ, এদের একাধিক স্ত্রী ছিল।[৬৪]

১১ শতাব্দীতে ইহুদী আইনে বহুপত্নী বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়। কেবল গার্ডসাম বেজ্ঞাহুদা একটি সিগ্‌নরড (Signord) প্রস্তাবে বলেন 'বহুপত্নীক বিবাহ উঠিয়ে দেয়া উচিত। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সেপট্রানিক ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুপত্নীক বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইসরাঈলের প্রধান রাবাইনাইট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। খৃষ্টান বাইবেল বহু পত্নীক বিবাহ অনুমতি দেয়। যেমন কয়েক শতাব্দী পূর্বে চার্চ এটি নিষেধ করে। হিন্দু আইনেও একাধিক বিয়ের অনুমোদন ছিল। ১৯৫৪ সালে যখন হিন্দু আইন পাস হয় তখন পুরুষের একাধিক বিয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। একটি কমিটির দ্বারা 'ইসলামে মহিলাদের মর্যাদা' বিষয়ক প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, মুসলিমদের মধ্যে বহু পত্নীক বিবাহের হার ৪.৩১ এবং হিন্দুদের মধ্যে ৫.০৬।[৬৫] তখন আমরা দেখি ইসলাম কেন বহু পত্নীক বিয়ের অনুমতি দিয়েছে?

ইসলাম পূর্ব যুগে পুরুষদের মধ্যে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। এমনকি একজন ব্যক্তির একশ' জন পর্যন্ত স্ত্রী ছিল। সে যুগেও যেনা ব্যভিচারের ছড়াছড়ি ছিল। স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-

৬৩. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃঃ ২৩১-২৩২।

৬৪. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ-৪, প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার, (ঢাকা : পিস পাবলিকেশন্স), পৃঃ ৫৬।

৬৫. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ-৪, প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার, (ঢাকা : পিস পাবলিকেশন্স), পৃঃ ৫৬।

মেয়ের কোন পরিচয় পর্যন্ত ছিল না। ইসলাম একাধিক বিয়েকে প্রয়োজনে অনুমতি দিয়েছে, তবে আবশ্যকীয় করেনি। এখানে একটি হোক আর চারটি হোক তাতে তেমন কোন বিষয় নয়। এখন আমরা দেখব, কেন ইসলাম একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়? এর উত্তর হ'ল-

প্রকৃতগত ভাবে ছেলে-মেয়ে সমানুপাতে জন্ম নেয়। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাদের বলে যে, মেয়ে ভ্রূণ ছেলে ভ্রূণের চেয়ে অধিক শক্তিশালী থাকে। ছেলে শিশুর চেয়ে মেয়ে শিশু অধিক প্রতিরক্ষা শক্তি পায়। মেয়ে শিশু শক্তিশালী এবং উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে জীবাণু ও রোগের সাথে লড়াই করতে পারে। তাই ছেলে শিশুর চেয়ে মেয়ে শিশুর হার বেশী। যুদ্ধের সময় মহিলাদের চেয়ে পুরুষেরা বেশী নিহত হয়। এমনকি সাম্প্রতিক সময়ে আফগানিস্তানে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাতে প্রায় পনের লাখ লোক নিহত হয়, যার অধিকাংশই পুরুষ। পরিসংখ্যান আমাদের বলে দেয়, মহিলাদের তুলনায় পুরুষেরা দুর্ঘটনায় বেশী নিহত হয়, মহিলাদের চেয়ে পুরুষরা বেশী মারা যায় সিগারেট সেবন ও অন্যান্য নেশার কারণে। ফলে পৃথিবীতে মহিলার সংখ্যা বেশী। ভারতেও পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশী। প্রতি বছর এখানে ১০ লাখের বেশী মেয়ে ভ্রূণ হত্যা করা হয়, সে জন্য মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সংখ্যা বেশী। অন্যথায় এই মেয়ে শিশু হত্যা বন্ধ করলে কয়েক মাসের মধ্যেই মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশী হয়ে যাবে। কেবল নিউইয়র্কেই পুরুষদের চেয়ে ১০ লক্ষ বেশী মহিলা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষদের চেয়ে ৭৮ লাখ মহিলা বেশী। সেখানে আড়াই কোটিরও বেশী সমকামী রয়েছে। তার সাথে তারা তাদের পুরুষ সঙ্গী পাচ্ছে না। শুধু ইংল্যাণ্ডে পুরুষদের চেয়ে ৪০ লক্ষ মহিলা বেশী রয়েছে। জার্মানিতে ৫০ লক্ষ এবং রাশিয়ায় ৭০ লক্ষ বেশী মহিলায় রয়েছে। আল্লাহই জানেন সমগ্র পৃথিবীতে পুরুষদের চেয়ে কত কোটি মহিলা বেশী রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে যদি প্রত্যেক পুরুষ একজন করে মহিলা বিয়ে করে, তাহ'লে অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ মহিলা বাকী থেকে যাবে যারা বিয়ে করার মত সঙ্গী পাবে না।[৬৬] এখন দেখা যাক, যে সমস্ত নারী বিয়ে করার জন্য কোন স্বামী পাবে না, নিশ্চয় তাকে কুমারী থাকতে হবে অথবা অবৈধ ভাবে পুরুষের সাথে যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হ'তে হবে। ডাক্তারীমতে মানুষের শরীরে প্রতিদিন যৌন হরমন তৈরী হচ্ছে এবং নিসৃত হচ্ছে। প্রশ্ন হ'ল- যেসব সাধকেরা নিজেদেরকে কুমার বলে দাবী করেন; পাহাড়ে হিমালয়ে যাবার সময় পিছনে দেব-দেবীদের নিয়ে যান। এক রিপোর্ট অনুযায়ী ইংল্যাণ্ডের চার্চের পাদ্রী এবং সন্যাসীদের অধিকাংশই ব্যভিচার ও সমকামিতায় লিপ্ত। অন্য কোন উপায় নেই; হয় এমন কাউকে নিয়ে করতে হবে যাদের ইতোমধ্যেই একজন স্ত্রী আছে অথবা সকলের গণ সম্পত্তিতে পরিণত হবে। তাহলে এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে ইসলাম কেন একাধিক বিয়ে করাকে সমর্থন দেয়। পৃথিবীর পরিবেশ শৃংখলা রক্ষা করা এর উদ্দেশ্য হ'তে পারে? শুধু তাই-ই না, একজন পুরুষ তার নানা কারণে একাধিক বিয়ের প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। যা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর বহু বিবাহের কারণ বিশ্লেষণ থেকে জানতে পারব। অনেকে রাসূল (ছাঃ)-এর একাধিক বিয়ের সমালোচনা করেন। কিন্তু তারা জানেন না যে, রাসূল (ছাঃ) কেন এমন করেছিলেন। নিম্নে তার বিবরণ তুলে ধরা হল :

রাসূল (ছাঃ) ইসলাম তথা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জাহেলিয়াতের যুগে মানুষের মধ্যে যুলুম অত্যাচারের পাশাপাশি নারী নির্যাতন, যেনা-ব্যভিচারে ছয়লাব বয়ে গিয়েছিল। নারীদের সামান্যতম কোন মর্যাদা ছিল না। পুরুষের কাছে নারীরা ছিল কেবল ভোগের বস্তু। কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেয়া হত। পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল (ছাঃ) মানবতার ইতিহাসে নারীদের সমাজের বুকে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতঃ নারীদেরকে নানাভাবে সম্মানিত করেছেন। তারই অংশ হিসাবে তিনি মহিলাদেরকে পবিত্র বিয়ের মাধ্যমে তাদের মান সমুজ্জ্বল করে তুলেছেন। এ ধারাবাহিকতায় রাসূল সমাজে বহু বিবাহের প্রচলন করেছিলেন এবং তিনিই (ছাঃ) নিজের জীবনে প্রথমে তা বাস্তবায়নের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দিয়েছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনে মোট ১৩ টি বিয়ে সংঘটিত হয়। এর মধ্যে ১১ জন স্ত্রীকে বহাল রেখে সহবাস পূর্বেই বিশেষ কারণে ২ জনকে ত্বালাক্ব দেন। পরবর্তীতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মুসলিমদের জন্য ৪টি বিয়ে বহাল রেখেছেন। নারীবাদীগণ এবং ইসলাম বিরোধীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর এসব বিয়েকে নিয়ে নানাভাবে কটাক্ষ করে থাকেন। এখনও তা অব্যহত রয়েছে। তারা বলেন, রাসূল (ছাঃ) নারী ভোগী ছিলেন, কেউবা বলেন, অর্থলোভী ছিলেন (?) ইত্যাদি (নাঊযুবিল্লাহ)। এক্ষুণে আমরা দেখব রাসূল (ছাঃ) এতগুলো বিয়ে কি কারণে করেছিলেন? সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এর এগারজন স্ত্রী গ্রহণকালের প্রেক্ষাপটসমূহ ধারাবাহিক ভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হ'ল :

(১) বিবি খাদিজার (রাঃ)-এর সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর বিবাহ :

রাসূল (ছাঃ) যখন বিবি খাদিজা (রাঃ)-কে বিয়ে করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ২৫ এবং খাদিজা (রাঃ)-এর বয়স ছিল ৪০ বছর। বিবি খাদিজা তাঁর ব্যবসার কাজে রাসূল (ছাঃ)-কে নিযুক্ত করার পর তাঁর ব্যবসায় অনেক শুনাম ও মুনাফা অর্জিত হয়। এতে খাদিজা খুশী হন। এত সম্পদ, অর্থ কি করবেন, ধনাঢ্য সতী-সাধ্বী নারী খাদিজা তা বুঝতে পারলেন। তাছাড়া তিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রূপে-গুণে ও বিশ্বাসে মোহিত হয়ে তাঁর বান্ধবী নাফিসা বিনতে মারিয়ার মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। রাসূল (ছাঃ) এ কথা চাচা আবু তালিবের নিকট জানালে চাচা এতে

৬৬. তদেব, পৃঃ ৫৭-৫৮।

রাযী হয়ে তাঁর সম্মতির কথা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে জানালেন। এতে মুহাম্মাদ (ছাঃ) রাযী হয়ে ৫০০ স্বর্ণ মুদ্রা খাদিজাকে মোহরানা দিয়ে বিয়ে সম্পন্ন করেন।

সুধী পাঠক! এখান থেকে কয়েকটি দিক ফুটে উঠে। তাহ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর যখন ভরা যৌবন, তখন ৪০ বছর বয়স্কা উপরিউক্ত দুইবার বিয়ে হওয়া, বিধবা মহিলা খাদিজাকে কেন বিয়ে করবেন? উত্তর হ'ল- খাদিজা ছিল অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, সম্মানিতা ও আরবের ধনাঢ্য মহিলা। তাঁর থেকে পরবর্তীতে সমাজের জন্য তথা ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। অহী নাযিলের সংকটকালে স্ত্রীর সান্ত্বনা, পরামর্শ ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা রাসূল (ছাঃ)-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজে লেগেছিল। স্ত্রীর অর্থ-সম্পদ অসহায় মানুষের জন্য এবং ইসলাম প্রচারের কাজে লাগানো হয়। নবী (ছাঃ)-এর বয়স যখন ৫০, তখন তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রাঃ) ৬৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। অথচ তাঁর জীবদ্দশায় রাসূল (ছাঃ) আর দ্বিতীয় বিয়ে করেননি।[৬৭] যৌবনে উদ্দীপ্ত (?) হ'লে এর মধ্যে তিনি বেশ কয়েকটি বিয়ে করতে পারতেন এবং তাও আবার আরবের সেই সময়ের সবচেয়ে সুন্দরী যৌবনপ্রাপ্তা শ্রেষ্ঠ গুণী রমনীদেরকে; কিন্তু তিনি (ছাঃ) তা করেননি। অর্থাৎ এখান থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বিবি খাদিজাকে স্ত্রী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন সম্পূর্ণ মানবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণ এবং দূরদর্শী নারী হিসাবে; মূলত নানা সহযোগিতা প্রাপ্তির জন্য। নারী ভোগী হিসাবে নয়। এখানে একজন বয়স্কা মেয়েকে বিয়ে করা যায় সেটাও ফুটে উঠে। কারণ এ বিয়েটা বরং খাদিজার জন্যও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। খাদিজা (রাঃ) একজন সম্মানিতা জান্নাতী নারী এবং বিশ্বের সফল নারীর পথিকৃত।

(২) সাওদা বিনতে যাম'আহ (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ :

বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর রাসূল (ছাঃ) ৫০ বছর বয়সী সাওদাকে বিয়ে করেন। ইসলামের সূচনালগ্নে পিতার চাচাতো ভাই সাকরানের সাথে বিয়ে হয় সাওদার। আত্মীয়-স্বজনের বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের যুলুম-অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর পরামর্শ অনুযায়ী আবিসিনিয়া হিযরত করেন। এখানে সন্তান আব্দুর রহমান জন্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে হালুলার যুদ্ধে আব্দুর রহমান নিহত হন। এর কিছুদিন পূর্বে স্বামী সাকরানও মারা যান। এ অবস্থায় সাওদা অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েন। পথে পথে ঘুরে বেড়ান। এদিকে সাওদা মুসলিম হওয়ার কারণে তার আত্মীয়-স্বজনেরাও কোন সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। এ মুহূর্তে শিশু পুত্র কোলে করে রাসূল (ছাঃ)-এর দূরসম্পর্কীয় খালা খাওলার বাড়িতে আশ্রয় নেন। খাওলার অবস্থাও অস্বচ্ছল ছিল। তবুও সাওদা অতি কষ্ট করে দিন গুজরান করতে থাকেন। এদিকে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয় চাচা ও অভিভাবক আবু ত্বালিব এবং স্ত্রী খাদিজার পরপর মৃত্যুতে তিনি (ছাঃ) ভেঙ্গে পড়েন। রাসূল (ছাঃ) মা হারা মা'ছুম বাচ্চা উম্মু কুলসুম ও ফাতিমাকে নিয়ে বেশ চিন্তায় পড়েন। খুব দুঃখ-কষ্টে স্ত্রীবিহীন সংসারধর্ম কালাতিপাত করতে থাকেন। ঘরের সমস্ত কাজ রাসূল (ছা)-কে করতে হ'ত। একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে তাঁর খালা ওছমান বিন মাযঊন-এর স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকীম নবী গৃহে এসে দেখেন যে, রাসূল (ছাঃ) নিজ হাতে থালা-বাসন পরিষ্কার করছেন! তখন তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে উঠিয়ে নিজ হাতে সেগুলো ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে বললেন, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! খাদিজার মৃত্যু তো তোমাকে অত্যন্ত দুঃখবোধ দেখছি। বললেন, ঠিক! ব্যাপার তো তাই। তখন খাওলা বললেন, 'হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! বর্তমানে তোমার সংসারে একজন পরিচর্যাকারিনীর প্রয়োজন।[৬৮] রাসূল (ছাঃ) তখন সম্মতি দিলেন এবং অসহায় সাওদার কথা বললেন। এ অবস্থায় মুহাম্মাদ (ছাঃ) বিয়েতে সম্মতি দিলেন এবং বিয়ে সম্পন্ন হ'ল। সাওদা (রাঃ) ছিলেন অনুভূতিহীন, যেদী আকৃতির এক (প্রায়) বৃদ্ধা মহিলা।

সুধী পাঠক! এখানে রাসূল (ছাঃ) তাঁর রূপ-যৌবন দেখে বিয়ে করেননি, নিজ সন্তানদের লালন-পালনের জন্য, সংসার ও অসহায় মহিলার দিকে তাকিয়ে সম্পূর্ণ মানবিক কারণে এই বিয়ে সংঘটিত হয়েছিল। এখানে কোন নারীর প্রতি আসক্তি হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

(৩) আয়েশা (রাঃ)-এর বিবাহ :

রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে আয়েশা (রাঃ)-এর বিয়ের কারণ সম্পর্কে আলোচ্য অধ্যায়ে পূর্বতঃ কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কিছু আলোকপাত করা হ'ল। আয়েশা (রাঃ)-এর জন্ম ও বিয়ের সন তারিখ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে তবে বিদ্বানগণ প্রায় একমত আয়েশা (রাঃ) নবুঅতের ২/৩ সনে জন্ম হয়েছিল এবং নবুঅতের ১০ম সনের শাওয়াল মাসে বিয়ে হয়েছিল। সে সময় তার বয়স হয়েছিল ৬ বছর আর রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ছিল ৫৪ বছর। হিজরী ২য় সনে শাওয়াল মাসে রাসূল (ছাঃ) ও আয়শা (রাঃ)-এর বাসর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সময় আয়েশার বয়স হয়েছিল ৯ বছর। আর নবী নন্দিনী ফাতিমা (রাঃ)-এর বয়স হয়েছিল তখন ১৭/১৮ বছর। মূলত রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে আয়েশার এই বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়েছিল। বিয়ের পূর্বে এক রাতে ফেরেশতার মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-কে স্বপ্নযোগে রুমালে আবৃত তার ছবি দেখানো হয়েছিল। আয়েশা (রাঃ)ই ছিলেন একমাত্র কুমারী স্ত্রী। আয়েশা (রাঃ)-এর বয়স যখন ১৮ বছর

৬৭. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) (রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ ২০১৫), পৃঃ ৭৬৩।

৬৮. রাসূল্লাহ (ছা) এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন (ঢাকা : পিস পাবলিকেশন্স, নভেম্বর ২০১১), পৃঃ ২৯-৩০।

সে সময় রাসূল (ছাঃ) ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখ্য, বিবাহের প্রাক্কালে আয়েশা (রাঃ)-এর পিতা আবুবকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, আপনি তো আমার দ্বীনী ভাই এবং ঘনিষ্ট সহচর কেমন করে এ বিয়ে হবে। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, সে যুগে এরূপ সম্পর্কীয় মেয়েদেরকে বিয়ে বসা নিন্দনীয় ছিল। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে সে কুপ্রথাকে উচ্ছেদ করলেন। আয়েশা (রাঃ)-এর মাধ্যমে দ্বীনের প্রচার-প্রসার, নারী ছাহাবীগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হাদীছ বর্ণনাকারী এবং সমাজকল্যাণ মূলক কাজে এক অসামান্য অবদান রাখেন। যা অন্য স্ত্রী অথবা কোন নারীর দ্বারা সম্ভব হয়নি। রাসূল (ছাঃ)-এর অসম বিয়ে নিয়ে কথিত পণ্ডিতগণ যে বিরূপ মন্তব্য করেন তা উপরিউক্ত বিশ্লেষণগুলো অনুধাবন করলেই যথেষ্ট হবে। রাসূল (ছাঃ) কখনও কেবল উপভোগের জন্য তাঁকে বিয়ে করেননি এবং এই সময়ের ব্যবধানে এই উদ্দেশ্যেও বিয়ে হয়নি। তাঁর বিয়ের মাধ্যমে বিশ্ব নারী সম্প্রদায়ের জন্য যথেষ্ট শিক্ষা রয়েছে। এছাড়া আবুবকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর এত ঘনিষ্ট ছিলেন এবং তার মাধ্যমে দ্বীনের যত পরিমাণ খেদমত হয়েছিল এবং হবে বলে রাসূল (ছাঃ) মনে করেছিলেন সম্ভবতঃ এই প্রিয় মানুষটির মেয়েকে বিয়ে করে কৃতজ্ঞতা দেখানোর পাশাপাশি আরও ঘনিষ্ট আত্মীয় হওয়াটা পসন্দ করেছিলেন এবং যেকারণে পরবর্তীতে প্রকৃত অর্থে তা কাজে লেগেছিল, যা বিশ্ববাসী অবলোকন করেছে। এসব ইতিহাস কোন মানুষ অস্বীকার করতে পারবে কি?।

(৪) হাফছাহ (রা)-এর বিয়ে :

ওমর (রাঃ)-এর কন্যা ছিলেন হাফসা (রাঃ)। তাঁর প্রথম স্বামী ছিলেন প্রখ্যাত ছাহাবী খুনাইস ইবনে হুযাইফাহ। দু'জনে মদিনায় হিজরত করেন। পরবর্তীতে ওহুদ যুদ্ধে খুনাইস শহীদ হলে হাফছাহ বিধবা হয়ে পিতা ওমর (রাঃ) গৃহে ফিরে আসেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। হাফছাহ্র এই নিঃসঙ্গ অবস্থা উত্তরণের জন্য পুনরায় বিয়ের জন্য চেষ্টা করেন। পিতা ওমর (রাঃ) প্রথমে আবুবকর (রাঃ)-এর কাছে মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেন। এতে আবুবকর উত্তর না দিয়ে চুপ থাকলেন। বিষয়টি ওমর (রাঃ)-এর খারাপ লাগলেও তিনি বুঝতে পারেন। এরপর তিনি ওছমান (রাঃ)-এর কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনিও একপ্রকার না বলে দিলেন। এ অবস্থায় ওমর (রাঃ) খুব মর্মাহত হলেন। পরে বিষয়টি দয়ার সাগর রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে খুলে বলেন। ওমরের এ কষ্টের দৃশ্য দেখে রাসূল (ছাঃ) নিজেই হাফছাহকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। ওমর (রাঃ) যারপরনাই খুশী হয়ে অত্যন্ত আনন্দে রাসূলের সাথে হাফছাহ্র (রাঃ)-কে বিয়ে দিলেন। হাফছাহ্র এসময় বয়স ছিল ২২, আর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বয়স ছিল ৫৫। রাসূল (ছাঃ)-এর দাম্পত্যকাল ছিল ৮ বছর।[৬৯] হাফছাহ খুবরাগী প্রকৃতির লোক ছিলেন। হাফসা (রাঃ) ৬৩ টি হাদীছ বর্ণনা করেন।

সম্মানিত পাঠকগণই বলুন, হাফছাহ (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ) কোন অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিয়ে করেছিলেন? এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, ইসলামের ইতিহাসে ওমরের যে অবদান তা অন্তত রাসূল (ছাঃ) কখনও ভুলতে পারেননি এবং পরবর্তীতে তার বিকল্প নেই সেটা তিনি (ছাঃ) বুঝতে পেরেছিলেন। যে কারণে কন্যা দায়গ্রস্ত ওমর (রাঃ)-এর কষ্ট লাগব করে কৃতজ্ঞতা দেখানো হয়েছিল। এছাড়া হাফছাহ (রাঃ) অনেক জ্ঞান ও গুণের সমন্বয়ে নারী ছিলেন, যার মাধ্যমে হাদীছ চর্চা তথা ইসলামের কল্যাণে তাঁর বিশাল অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ছিলেন জান্নাতী। অর্থাৎ এ কথা স্পষ্ট যে, প্রায় বার্ধক্যে উপনীত অর্থাৎ ৫৫ বছর বয়সে রাসূল (ছাঃ) সম্পূর্ণ মানবিক, ইসলামের প্রসার ও রাজনৈতিক প্রভৃতি কারণে তাঁকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অন্য কোন কারণে নয়, যেটা প্রগতিবাদী ও নারীবাদীরা সহজে বুঝতে পারেন। এর সাথে মানবাধিকার কর্মীদেরও বুঝতে বাকী থাকার কথা নয় যে, রাসূল (ছাঃ) এই সকল নরীদেরকে আশ্রয় দিয়ে কতটা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গিয়েছেন।

(৫) যয়নাব বিনতে খুযায়মা (রাঃ)-এর বিয়ে :

যয়নাব (রাঃ)-এর সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের বিয়ে হয়। এটা যয়নাবের দ্বিতীয় বিয়ে। প্রখ্যাত এই ছাহাবী ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। এ অবস্থায় যয়নাব অসহায় হয়ে পড়ে। তার আত্মীয়-স্বজনের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও কোন ঠাঁই পাইনি। এদিকে ওহুদ যুদ্ধে ৭০ জন ছাহাবী শহীদ হলে বিধবাদের কে আশ্রয় দিবে এরকম চিত্র সকলের মাঝে ফুটে উঠে। এ অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) যয়নাবকে (রাঃ) বিয়ে করেন। এ সময় যয়নাব (রাঃ)-এর বয়স ছিল প্রায় ৩০ বছর এবং মুহাম্মাদ (ছা) এর বয়স ছিল ৫৫। যয়নাব (রাঃ) গরীব-দুঃখীদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। এজন্য তাঁর ডাক নাম ছিল 'গরীব-দুঃখীর মা'। বহু ঘটনা আছে যে, তিনি খেতে বসেছেন এমন সময় ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক এসে খাবার চেয়েছে, ব্যাস! তিনি নিজের খাবারটাই দিয়ে দিয়েছেন। এ জন্য ইসলাম গ্রহণের আগে বাল্যকালেই তিনি উম্মুল মাসাকীন বা মিসকিনদের মা নামে আরবে পরিচিত ছিলেন।[৭০] তাহলে বুঝা যায় যে, সম্পূর্ণ মানবিক কারণে এবং ইসলামের বড় খাদেমা, বিশেষ করে গরীব-দুঃখীদের বন্ধু হিসাবে রাসূল (ছাঃ) তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। যা থেকে বর্তমান বিশ্বের মুসলিম বিশেষ করে নারী সমাজের বিশেষ শিক্ষা রয়েছে। *(ক্রমশঃ)*

[লেখক : শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

৬৯. সীরাতুল রাসূল (ছাঃ), ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৭৬৪।
৭০. রাসূলের স্ত্রীগন যেমন ছিলেন; পিস পাবলিকেশন, ঢাকা, পৃঃ ১০৮।

ইমাম বাগাভী (রহঃ)

-আব্দুল্লাহ

ভূমিকা :

হিজরী পঞ্চম শতকে যে সকল তাফসীরবিদ ও হাদীছবিদ অক্লান্ত পরিশ্রমে হাদীছ ও তাফসীরশাস্ত্র সর্বাপেক্ষা উন্নতি, অগ্রগতি ও প্রসার লাভ করেছে তাদের মধ্যে ইমাম বাগাভী (রঃ) ছিলেন অন্যতম। ইমাম বাগাভী (রহঃ) ছিলেন এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, হাদীছশাস্ত্রের এক অনন্য দিকপাল, হাদীছ সমালোচনা ও রিজাল শাস্ত্রের অভিজ্ঞ পণ্ডিত এবং হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর এক মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন হাদীছের হাফিয, হুজ্জাহ এবং বিশ্বস্ত হাদীছ বর্ণনাকারী। তিনি ছিলেন 'আবিদ, যাহিদ, ফক্বীহ এবং ইতিহাস ও সনদ সম্পর্কে অভিজ্ঞ। তিনি অনেক গ্রন্থের রচয়িতা। তার সংকলিত 'মাছাবিহুস সুন্নাহ' (مصابيح السنة) গ্রন্থটি হাদীছ শাস্ত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। কিতাবটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অনেক ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে এই কিতাবটি শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহঃ) পরবর্তীতে সম্পাদনা করেন এবং এর নামকরণ করেন 'মিশকাতুল মাছাবীহ' (مشكاة المصابيح)।

নাম ও বংশ পরিচয় :

তাঁর নাম- আবু মুহাম্মাদ আল-হোসাইন ইবনু মাসঊদ ইবন মুহাম্মাদ আল-ফাররা।[৭১] কুনিয়াত-আবু মুহাম্মাদ (ابو محمد), উপাধি 'মুহয়িস সুন্নাহ' (محي السنة) এবং রুকনুদ্দীন (ركن الدين)।[৭২] তাঁকে 'আল-ফারবা' বা চর্ম ব্যবসায়ী ও চর্মশিল্পী নামে ডাকা হয়। তিনি এই উপাধি নিজের ও পিতার পেশার সূত্রে লাভ করেন।[৭৩] তাঁর নাম সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থাকার বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেন। ইসলামী বিশ্বকোষে তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করে বলা হয়- আল বাগাভী রুকনুদ্দীন মুহয়িস সুন্নাহ মুহাম্মাদ আল-হোসাইন ইবনু মাসঊদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-ফাররা বা ইবনুল ফাররা।[৭৪] তাঁর নাম সম্পর্কে তাফসীরে বাগাভীতে বলা হয়েছে,

هو الإمام الحافظ، الفقيه المجتهد محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفرَّاء البغوي الشافعي ويلقب بركن الدين.

'তিনি ইমাম, হাফেয, ফক্বীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁর উপাধি মুহয়িস সুন্নাহ। আবু মুহাম্মাদ আল-হোসাইন ইবনু মাসঊদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-ফাররা আল-বাগাভী আশ-শাফেয়ী। তার লক্বব রুকনুদ্দীন'।[৭৫]

জন্ম ও জন্মস্থান :

আবু মুহাম্মাদ হোসাইন ইবনু মাসঊদ আল-ফাররা 'বাগ' (بغ) ও 'বাগশূর' (بَغْشُوْر) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। আর বাগ ও বাগশূর হ'ল 'মারওয়া' (مروا) ও 'হিরাত' (هراة)-এর মধ্যবর্তী 'খুরাসান' (خراسان)-এর একটি শহরের নাম। ইসলামী বিশ্বকোষেও তাঁর জন্মস্থানের শহরের নাম হিসাবে 'বাগ' অথবা 'বাগশূর'-কে উল্লেখ করা হয়েছে। যা হিরাতের একটি নিকটবর্তী গ্রামের নাম।[৭৬] তবে ইমাম বাগাভী (রঃ)-কে 'খুরাসান' শহরের দিকে নিসবত করে বাগাভী বলা হয়। আর খুরাসান শহর হ'ল 'মারওয়া' (مروا) এবং 'হিরাত' (هراة)-এর মাঝখানে অবস্থিত, যাকে 'বাগ' (بغ) ও 'বাগশূর' (بَغْشُوْر) নামে অভিহিত করা হয়।[৭৭]

بفتح الباء الموحدة) শব্দটি باء ও غين-এ ফাতাহ البغوي (والغين المعجمة. হরকতযুক্ত, তারপর واو। আর এটা নিসবত হ'ল খুরাসান শহরের সাথে, যা 'মারওয়া' (مروا) এবং 'হিরাত' (هراة)-এর মধ্যবর্তী। যাকে বলা হয় 'বাগ' (بغ) ও 'বাগশুর' (بَغْشُوْر)। ইমাম বাগাভী (রঃ)-এর জন্ম সাল সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। তথ্যসূত্র অভিধান প্রণেতাগণ, যারা তার জীবনী উল্লেখ করেছেন তারা কেহই তার জন্ম তারিখ উল্লেখ করেননি। তবে ইয়াকূত আল-হামাবী (ياقوت الحموي) তার معجم البلدان নামক গ্রন্থে তার জন্ম তারিখ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ইমাম বাগাভী (রঃ) ৪৩৩ (হিঃ)-তে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লামা যারকালী (الزركلي) তার الأعلام নামক গ্রন্থে বলেন, বাগাভী (রঃ) ৪৩৬ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন।[৭৮]

---

৭১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৯/৪৩৯ পৃঃ; শাযরাতুয যাহাব ৪/৪৮-৪৯ পৃঃ; ওফায়াতুল আইয়ান ২/১৩৬ পৃঃ; তাযকিরাতুল হুফফায ৪/১২৫৭ পৃঃ; তারীখুল ইসলাম ৪/২২২ পৃঃ; মিরাতুল জিনান ৩/২১৩ পৃঃ; মু'জামুল মুআল্লিফীন ৪/৬১ পৃঃ; কাশফুয যুনূন, পৃঃ ১৯৫ ও ৫১৭।

৭২. তাবাকাতুল মুফাসসিরীন ১/৩৮ পৃঃ; আল্লামা সুয়ূত্বী বলেন, يعرف بابن الفراء ويلقب محيي السنة وركن الدين أيضا।

৭৩. তাফসীরে বাগাভী ১/১৪ পৃঃ- والفراء: نسبة إلى عمل الفراء وبيعها।

৭৪. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ যিল'কাদা ১৪১৪/মে ১৯৯৪, প্রকাশক, আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ওমর আলী) ১৫/৩৯০ পঃ।

৭৫. তাফসীরে বাগাভী ১/১৪ পৃঃ।

৭৬. ইসলামী বিশ্বকোষ ১৫/৩৯০ পৃঃ।

৭৭. তাফসীরে বাগাভী ১/১৬ পৃঃ।

৭৮. তাফসীরে বাগাভী ১/১৬ পৃঃ।

বাল্যকাল :

ইমাম বাগাভী (রঃ)-এর বাল্যকাল সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। বাল্যকাল তিনি তাঁর পিতা-মাতার নিকট অতিবাহিত করেন। প্রাথমিক শিক্ষা পিতা-মাতার নিকটই গ্রহণ করেন। তাদের নিকট তিনি কুরআন হেফয করেন। তার ঘরের ও বাইরের পরিবেশ ছিল জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান বিতরণের অনন্য পরিবেশ। যদিও তার পিতা একজন চর্ম ব্যবসায়ী ছিলেন।

শিক্ষা জীবন :

ইমাম বাগাভী (রহঃ) শৈশবে পিতা-মাতার স্নেহ-মমতায় প্রতিপালিত হন। তাঁদের নিকটেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। শৈশবেই তিনি অসাধারণ মেধাবী, চরিত্রবান ও বিনম্র স্বভাবের বালক হিসাবে সহপাঠী ও বাল্য সাথীদের মাঝে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি কিশোর বয়সেই হাদীছ শিক্ষা শুরু করেন। সাথে সাথে তাফসীর, ইতিহাস ও অন্যান্য ইসলামী বিষয়ও অধ্যয়ন করতে থাকেন। ইমাম বাগাভী (রঃ) অসংখ্য মুহাদ্দিছগণের নিকট হ'তে তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ ও ইতিহাস শিক্ষা লাভ করেন। তিনি খুরাসানের অন্যতম মুহাদ্দিছ কাযী হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ আল-মারওয়াযিয়্যু (القاضي حسين بن محمد المَرْوْزي)-এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন।[৭৯]

তাছাড়া হেজাজের অন্যতম শায়খ, ফক্বীহ আবুল হাসান আলী ইবন ইউসুফ (মৃত ৪৬৩ হিঃ) (أبو الحسن علي بن يوسف)-এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তিনি খুরাসান, হেজাজ, নাইশাপুর সহ তৎকালীন ইলমের বিখ্যাত শহরগুলোতে বিখ্যাত শিক্ষকবৃন্দের নিকট তার শিক্ষা জীবন অতিবাহিত করেন।

ইমাম বাগাভী (রঃ)-এর শিষ্যবৃন্দ :

ইমাম বাগাভী (রহঃ) অতি অল্প কালের মধ্যেই ইলমে তাফসীর, ইলমে হাদীছ, ইতিহাস ও ফিক্বহ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইমাম বাগাভী (রহঃ)-এর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার কারণে অসংখ্য হাদীছ অন্বেষণকারী ব্যক্তি তার সান্নিধ্যে আগমন করেন। সমসাময়িক বরেণ্য বিদ্বানগণও তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করতে আসেন। তাফসীরে বাগাভীতে বলা হয়,

لقد أقبل عليه طلاب العلم لكثرة علمه وفضله وسعة معرفته بعلوم كثيرة.

'জ্ঞানপিপাসু ছাত্রবৃন্দ তার নিকটবর্তী হয়, তার জ্ঞানের আধিক্য, মর্যাদা, জ্ঞানের প্রশস্ততা এবং অত্যাধিক ইলমের কারণে।[৮০] নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম হলেন,

(১) শায়খ আবু মানছূর মুহাম্মাদ ইবনু আস'আদ ইবনু মুহাম্মাদ (الشيخ أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد) : ইমাম বাগাভীর ছাত্রদের মধ্যে ইনি ছিলেন অন্যতম একজন ছাত্র। ৫৭১ হিজরীতে এই মহামনীষী ইন্তেকাল করেন।[৮১] তিনি ইমাম বাগাভী (রহঃ)-এর কিতাব معالم و شرح السنة-এর অন্যতম রাবী ছিলেন। 'শাযারাতুয যাহাব' প্রণেতাও অনুরূপ কথা বলেন।[৮২]

(২) মুহাম্মাদ ইবন আবি জা'ফর (محمد بن أبي جعفر) : তিনি একজন বড় মাপের আলেম ও লেখক ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থের রচয়িতা। তার রচিত অন্যতম একটি গ্রন্থ হল الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل اليقين। এই মহান মনীষী ৫৫৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৮৩]

(৩) আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (أبي سعيد محمد بن أحمد) : তিনি ৬০০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৮৪]

(৪) হুসাইন ইবনু মাসঊদ (الحسن بن مسعود البغوي) : হুসাইন ইবনু মাসঊদ হলেন ইমাম হুসাইন আল-বাগাবীর ভাই। 'তাবাকাতুশ শাফী' গ্রন্থাকার তার সম্পর্কে বলেন, الحسن بن مسعود البغوي أبو علي أخو الإمام الحسين البغوي تفقه على أخيه 'হুসাইন ইবনু মাসঊদ আল-বাগাভী হলেন আলীর পিতা এবং ইমাম হুসাইন আল-বাগাভীর ভাই। তিনি তার ভাইয়ের নিকট পাণ্ডিত্য অর্জন করেন'।[৮৫]

(৫) আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ (عبد الرحمن بن عبد الله) : তাঁর সময়ের অন্যতম মুহাদ্দিছ এবং হাফেয ছিলেন।[৮৬]

(৬) আবু মুক্বাতিল আদ-দায়লামী (أبو مقاتل الديلمي) : তাকে ইমাদুদ্দীন (عماد الدين) বলা হয়। তিনি একজন বড় মাপের ছাত্র ছিলেন। ৫৪৬ হিজরীতে তার এই মহান ছাত্র পরলোক গমন করেন।[৮৭]

(৭) মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন (محمد بن الحسين) : তিনি ৫৫৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৮৮]

(৮) আব্দুর রহমান ইবনু আলী (عبد الرحمن بن علي) : তিনি অন্যতম একজন ছাত্র ছিলেন। ৫৪২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[৮৯] *(চলবে)*

[লেখক : এম.এ. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

---

৭৯. শাযারাতুয যাহাব ৩/৩১০ পৃঃ; সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা ১৮/২৬১; ওফায়াতুল আইয়ান ২/১৩৪ ; কাশফুয যুনূন ১/৪২৪।
৮০. তাফসীরে বাগাভী ১/১৭ ।
৮১. শাযারাতুয যাহাব ৪/২৪০; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২০/৫৩৯; তাযকিরাতুল হুফ্ফায ৪/১৩৩৩; আল-বিদায়াহ ১২/২৯৯।
৮২. শাযারাতুয যাহাব ৪/২৪০।
৮৩. শাযারাতুয যাহাব ৪/১৭৫; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২০/৩৬০।
৮৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২১/৪১৩।
৮৫. তাবাকাতুশ শাফেয়ী আল-কুবরা ৪/৩০০।
৮৬. তাফসীরে বাগাভী ১/১৭।
৮৭. তাবাকাতুশ শাফেয়ী আল-কুবরা ৪/৩০০।
৮৮. তাফসীরে বাগাভী ১/১৭।
৮৯. পূর্বোক্ত ১/১৭।

শিশু-কিশোরদের উপর নৃশংস নির্যাতন : কারণ ও প্রতিকার

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান

(২য় কিস্তি)

ইসলামের দৃষ্টিতে শিশু-কিশোরদের প্রতি আচরণ :

একটি সুন্দর ও আদর্শ ব্যক্তি, পরিবার, সুশৃঙ্খল সমাজ ও দেশ গড়ার জন্য প্রয়োজন শিশু-কিশোরদের সুস্থ বিকাশের সার্বিক ব্যবস্থা করা। ইসলাম শিশু-কিশোরদের সাথে ভাল ও উত্তম আচরণ করার জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদীছে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছে। জাহেলী যুগের বর্বর মানুষেরা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিত। বতমান যুগের শিশু নির্যাতনের ঘটনা জাহেলী যুগকেও হার মানিয়েছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ কঠোর হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেন, وَلَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ ‘এবং তোমরা দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা কর না। আমিই তোমাদের এবং তাদের খাদ্য প্রদান করে থাকি’ *(আন‘আম ৬/১৫১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيْرًا ‘তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্রের ভয়ে হত্যা কর না। তাদেরকে ও তোমাদেরকে আমি রিযিক দিয়ে থাকি, তাদের হত্যা করা মহাপাপ’ *(বানী ইসরাঈল ১৭/৩১)*।

স্বামী-স্ত্রীর আবেগ ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রেম-ভালবাসার পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে সন্তানের মাধ্যমে। সন্তান সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ‘ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য’ *(কাহফ ১৮/৪৬)*। অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ হচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর মাধ্যম। আর সন্তান-সন্ততি হচ্ছে বংশ বিস্তার তথা মানব প্রজাতি রক্ষার মাধ্যম। রাসূল (ছাঃ) সন্তানদেরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসাবে ঘোষণা করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِه أَوْ يُنَصِّرَانِه أَوْ يُمَجِّسَانِه ‘প্রত্যেক আদম সন্তান ফিৎরাতের (ইসলামের) উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী, খ্রীষ্টান অথবা অগ্নী উপাসক বানায়’।[৯০]

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিশুদের সাথে মুচকি হেসে সর্বোত্তম আচরণ করতেন, সালাম বিনিময় করতেন, খেলাধুলা ও কৌতুক করতেন। তাদেকে আদর-যত্ন করতেন, ভালবাসতেন এবং তাদেরকে স্নেহ, মায়া-মমতায় ভরিয়ে দিতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন,

جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ.

‘একদা এক বেদুইন নবী (ছাঃ)-এর খেদমতে আসল (সে দেখল ছাহাবায়ে কেরাম নিজেদের শিশু সন্তানদের চুমু দিয়ে আদর করছেন।) তখন সে বলল, তোমরা কি শিশুদের চুম্বন কর? আমরাতো শিশুদের চুম্বন করি না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি আল্লাহ তা‘আলা তোমার অন্তর হ’তে স্নেহ-মমতা বের করে ফেলেন তবে আমি কি তা বাধা দিতে সক্ষম হব’?[৯১]

অন্য হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন

قَبَّلَ رَسُوْلُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيْمِىُّ جَالِسًا فَقَالَ الأَقْرَعُ إِنَّ لِى عَشَرَةً مِنَ الْوَلَد مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْه رَسُوْلُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ.

‘একদা রাসূল (ছাঃ) হাসান বিন আলীকে চুম্বন করেন। তখন সেখানে বসা ছিলেন আক্বরা বিন তামীমী (রাঃ)। তিনি বলেন, আমার দশটি সন্তান রয়েছে, আমি তাদের কাউকে চুম্বন করি না। রাসূল (ছাঃ) তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না’।[৯২] এছাড়া রাসূল (ছাঃ) সোনামণিদের নিষ্পাপ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।[৯৩] রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে আদর-স্নেহ, মায়া-মমতা ও হৃদয়ের ভালবাসা দিয়ে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির পাথেয় ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসাবে গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন।[৯৪] সাহল ইবনু সা‘দ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. ‘আমি ও ইয়াতীম পালনকারী জান্নাতে এমনভাবে থাকব। তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা

৯০. বুখারী হা/১৩৮৫।

৯১. বুখারী হা/৫৯৯৮; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৪৮।
৯২. বুখারী হা/৫৯৯৭।
৯৩. বুখারী হা/১৩৮৫।
৯৪. মুসলিম হা/১৬৩১।

আঙ্গুলের মধ্যে সামান্য ফাঁকা রেখে ইশারা করে দেখালেন'।[৯৫]

ছালাতরত অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) শিশুদেরকে তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ থেকে বঞ্চিত করতেন না। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَكَانَ لِىْ أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسِبُهُ فَطِيْمٌ وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ.

'আমার এক ছোট ভাই ছিল তার নাম আবু উমায়ের। আমার মনে আছে সে যখন এমন শিশু যে, মায়ের দুধ ছেড়েছে মাত্র। রাসূল (ছাঃ) তার কাছে আসতেন। আমার ভাই আবু উমায়েরের নুগায়ের নামে ছোট একটি পাখি ছিল। সে পাখির সাথে খেলা করত। একদা পাখিটি মারা গেলে আবু উমায়েরের মন বিষন্নতায় ভরে গেল। নবী (ছাঃ) তখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, হে আবু উমায়ের, কি হল তোমর নুগায়ের? নবী করীম (ছাঃ)-এর মুখের ছন্দ ও সুর শুনে বিষন্ন আবু উমায়ের হেসে ফেলল'।[৯৬] রাসূল (ছাঃ) শিশুদের সাথে অনুরূপ নির্দোষ কৌতুক করতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ 'একদা রাসূল (ছাঃ) কতিপয় বালকের নিকট দিয়ে গমন করলেন এবং তাদেরকে সালাম দিলেন'।[৯৭] রাসূল (ছাঃ) ছোট-বড়, পুরুষ-মহিলা সকলের সাথে সাক্ষাতে সালাম দিতেন ও পুরুষদের সাথে মুছাফাহা করতেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَبَسُّمُكَ فِىْ وَجْهِ أَخِيْكَ صَدَقَةٌ 'মিষ্টি হেসে একটি ভাল কথা বলাও ছাদাক্বাহ'।[৯৮] হাদীছে এসেছে,

عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ سَرِيْعٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَزَوْتُ مَعَهُ فَأَصَبْتُ ظَهْرًا فَقَتَلَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ حَتَّى قَتَلُوا الْوِلْدَانَ وَقَالَ مَرَّةً الذُّرِّيَّةَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ جَاوَزَهُمُ الْقَتْلُ الْيَوْمَ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّمَا هُمْ أَوْلاَدُ الْمُشْرِكِيْنَ. فَقَالَ أَلاَ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَبْنَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ قَالَ أَلاَ لاَ تَقْتُلُوْا ذُرِّيَّةً أَلاَ لاَ تَقْتُلُوْا ذُرِّيَّةً قَالَ كُلُّ نَسَمَةٍ تُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا فَأَبَوَاهَا يُهَوِّدَانِهَا وَيُنَصِّرَانِهَا.

আসওয়াদ ইবনু সারী' (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। তাঁর সাথে হয়ে যুদ্ধ করলাম এবং যুদ্ধে সফল হলাম। সেদিন অনেকেই হত্যা হয়েছিল; এমনকি শিশুদেরকেও হত্যা করা হয়েছিল। রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আজ মানুষের কি হ'ল তারা হত্যায় সীমালঙ্ঘন করল। এমনকি তারা সন্তানদের হত্যা করল। একজন ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তারা কি মুশরিকের সন্তান নয়? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, মুশরিকের সন্তানরা হ'তে পারে তোমাদের চেয়ে উত্তম মানুষ। তারপর বললেন, তোমরা সন্তান হত্যা কর না। তোমরা সন্তান হত্যা করা না। সন্তান তাওহীদের উপর জন্মগ্রহণ করে। যতক্ষণ না সে কথা বলতে পারে। যখন কথা বলতে শেখে তখন তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী করে দেয়, খ্রীষ্টান করে দেয়।[৯৯]

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূল (ছাঃ) অছিয়ত করলেন,... وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِى اللَّهِ 'তুমি তোমার উপার্জিত সম্পদ তোমার পরিবারের সামর্থ্য অনুসারে ব্যয় কর। পরিবার-পরিজনকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের ব্যাপারে শাসন থেকে বিরত থেক না। আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে পরিবারের লোকজনকে ভীতি প্রদর্শন কর'।[১০০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ؛ فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ 'পরিবারকে সংশোধন করার জন্য চাবুক এমন স্থানে রাখ; যেন পরিবার তা দেখতে পায়। কারণ এটাই তাদের জন্য শিষ্টাচার'।[১০১] জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ 'যে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করেন না'।[১০২]

শিশু-কিশোদের প্রতি অত্যাচার-নির্যাতন, হত্যা-ধর্ষণ সম্পর্কে ইসলামের দিক-নির্দেশনা :

(ক) অত্যাচার প্রসঙ্গে : মানুষের প্রতি অত্যাচার ও অমানবিক আচরণ করা ইসলামে কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। অত্যাচারী মানুষকে মানুষ ভয় করে। সাধারণত প্রভাবশালী সকল মানুষ দুর্বল মানুষদের প্রতি অত্যাচার করে থাকে। অত্যাচারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ 'নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারীদের পসন্দ করেন না' *(শূরা ৪২/৪০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي

৯৫. বুখারী হা/৫৩০৪; আবুদাঊদ হা/৫১৫০; তিরমিযী হা/১৯১৮; মিশকাত হা/৪৯৫২।
৯৬. বুখারী হা/৬২০৩।
৯৭. মুসলিম হা/৫৭৯১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৪।
৯৮. মিশকাত হা/১৯১১, সনদ ছহীহ।
৯৯. মুসনাদে আহমাদ হা/১৫৬২৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪০২, সনদ ছহীহ।
১০০. মুসনাদে আহমাদ হা/২২১২৮; মিশকাত হা/৬১; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৫৭০; ইরওয়াউল গালীল হা/২০২৬, সনদ হাসান।
১০১. ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/১০৬৭১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৪৭; ছহীহুল জামে' হা/৪০২২, সনদ হাসান।
১০২. বুখারী হা/৭৩৭৬; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৪৭।

الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ‘অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়; তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি’ *(শূরা ৪২/৪২)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‘অত্যাচার ক্বিয়ামতের দিন হবে অন্ধকার’।[১০৩] রাসূল (ছাঃ) মু‘আয (রাঃ)-কে ইয়ামানে পাঠানের পূর্বে উপদেশ দিয়ে বলেন, وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ‘তুমি অত্যাচারিত ব্যক্তির বদ দো‘আ থেকে বেঁচে থাক। কারণ অত্যাচারিত ব্যক্তির বদ দো‘আ ও আল্লাহ্র মাঝে কোন পর্দা নেই অর্থাৎ তার দো‘আ কবুল হয়’।[১০৪]

(খ) হত্যাকারী প্রসঙ্গে : সবচয়ে বড় পাপের মধ্যে মানুষ হত্যা একটি মহাপাপ। পরকালে হত্যাকারী ভীষণ ও কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا ‘যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মুসলিমকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম। তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন। তাকে অভিশাপ করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন’ *(নিসা ৪/৯৩)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ‘নিশ্চয় যে ব্যক্তি প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ ব্যতীত অন্যকে হত্যা করে অথবা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে। সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে’ *(মায়েদাহ ৫/৩২)*। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাক।...তার একটি হচ্ছে অবৈধভাবে মানুষকে হত্যা করা’।[১০৫] জারীর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা অগোচরে পরস্পর হত্যা করে কাফের হয়ে ফিরো না’।[১০৬] ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘মানুষ যতদিন অবৈধভাবে হত্যা না করবে ততদিন পর্যন্ত ইসলামের উপর থাকবে’।[১০৭] পৃথিবীর ধ্বংস হওয়ার চেয়ে একজন মুমিনকে হত্যা করা আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে বড় অপরাধ।[১০৮]

(গ) ধর্ষণ ও যেনা প্রসঙ্গে : যে সব পাপের কারণে দুনিয়াতেই কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে যেনা তার মধ্যে অন্যতম। দুনিয়াতে দু’টি বড় পাপের বাস্তব প্রতিক্রিয়া খুবই নিন্দনীয়। যেনা তার একটি। যেনাকারীর সামাজিক বিচার যেমন অপমানজনক, তেমন দুর্নাম ছড়িয়ে যায় খারাপ মানুষ হিসাবে। যেনা বা ধর্ষণকারী ইহকালেও ক্ষতিগ্রস্ত পরকালেও ক্ষতিগ্রস্ত। এটা এমন একটা পাপ, যার মাধ্যম অনেক। যেমন- চোখ, হাত, পা, মুখ, কান, অন্তর ও লজ্জাস্থান। এগুলোর দ্বারা মানুষ যেনার মত জঘন্য পাপ করে থাকে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا ‘তোমরা যেনার নিকটবর্তী হয়ো না। এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ’ *(বানী ইসরাঈল ১৭/৩২)*। অন্যত্র বলেন,

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا- يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا- إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا.

‘তারা আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কোন মা‘বূদকে ডাকে না, শরী‘আত সম্মত কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করে না এবং যেনা করে না। আর যে ব্যক্তি এই সকল কাজ করে সে শাস্তিভোগ করবে। ক্বিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং এ শাস্তি লাঞ্ছিত অবস্থায় সে অনন্তকাল ভোগ করতে থাকবে। তবে যে তওবা করে এবং সৎ আমল করে সে এর অন্তর্ভুক্ত নয়’ *(ফুরক্বান ২৫/৬৮-৭০)*। হাদীছে এসেছে,

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তিন ধরণের ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের পবিত্রও করবেন না’। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হচ্ছে- (১) বৃদ্ধ যেনাকার (২) মিথ্যাবাদী শাসক এবং (৩) অহংকারী দরিদ্র ব্যক্তি’।[১০৯] রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মানুষের দু’চোখের যেনা দেখা, দু’কানের যেনা শুনা, জিহ্বার যেনা কথা বলা, হাতের যেনা স্পর্শ করা, পায়ের যেনা যেনার পথে চলা, অন্তরের যেনা আকাঙ্ক্ষা করা এবং লজ্জাস্থান তার সত্যা-মিথ্যার প্রমাণ করে’।[১১০] *(চলবে)*

[লেখক : প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি]

---

১০৩. বুখারী হা/২৪৪৭; মুসলিম হা/৬৭৪১-৪২; তিরমিযী হা/২০৩০; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৬৫ ও ৫১২৩।
১০৪. মুসলিম হা/১৩০; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২।
১০৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৭।
১০৬. বুখারী ১/২৩ পৃঃ ‘ইলম’ অধ্যায়।
১০৭. বুখারী হা/১২১।
১০৮. ইবনু মাযাহ হা/২১৩৮।
১০৯. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮৮২।
১১০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৬।

ইসলামী পাঠদানের পদ্ধতি

-অনুবাদ : আব্দুল্লাহ খোরশেদ

[লেখক পরিচিতি : 'পাঠদানের পদ্ধতি' শিরোনামে গ্রন্থটির মূল লেখক মোট তিনজন। তারা হ'লেন- ড. আব্দুর রহমান আল-খালাকী, ড. মুহাম্মাদ আলী আল-কারুবী এবং ড. আলী বিন সুলতান আল-হাকামী। এঁরা সকলেই মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরবের সম্মানিত শিক্ষক। উপরিউক্ত শিক্ষকত্রয়ের মধ্যে কেবলমাত্র ড. আলী বিন সুলতান আল-হাকামীর জীবনী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য পাওয়া গেছে, যা নিম্নরূপ : তিনি ১৩৬০ হিঃ সালে সঊদী আরবের প্রসিদ্ধ জাযান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪০০ হিঃ সালে উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী এবং পরবর্তীতে ১৪০২ সালে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগে সহযোগী প্রফেসর হিসাবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে প্রফেসর হিসাবে উন্নিত হন। ১৪০৮ সালে একই বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আদব ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপরে অসংখ্য গ্রন্থ, প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় রচনা করে গেছেন। অবশেষে ২৬/১১/১৪২৯ হিঃ সালের সোমবার দিন মাগরিবের ছালাতের আগ মুহূর্তে ইন্তেকাল করেন। উল্লেখ্য যে, এ গ্রন্থের বাকী দু'জন লেখক- ড. আব্দুর রহমান আল-খালাকী ও ড. মুহাম্মাদ আলী আল-কারুবী সম্পর্কে তেমন কিছুই আমরা অবগত হতে পারিনি। তবে দু'জনই মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক]

ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য :

দুনিয়ার প্রত্যেক কর্ম সম্পাদনকারীর তার কর্ম সম্পাদনের পিছনে একটি লক্ষ্য আছে। একইভাবে একজন সম্মানিত মুসলিমের লক্ষ্য হ'ল, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং নবদীপ্ত তরুণদের আল্লাহ্র শরী'আত, তাওহীদ, তাঁর দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও সর্বোপরি তার আদেশ-নিষেধের প্রতি আমল করার শিক্ষা দেওয়া। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 'আমি জিন ও মানবজাতিকে আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*।

এছাড়াও ছাত্রদের কাছে দ্বীনের সুক্ষ্ম বিষয়গুলো, ইসলামের পরিচিতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা ও তার কর্তব্য, যার উপর ভিত্তি করে তাদের ইবাদত, পারস্পরিক লেনদেন ও দুনিয়ার চলাফেরা ইত্যাদি বিষয়গুলো আবর্তিত হয়। অতএব সকল ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল, মুসলিম সন্তানদের আল্লাহ্র একনিষ্ঠ ইবাদত, তাওহীদ, ইসলাম ও ঈমানের স্তম্ভগুলোর প্রতি জাগ্রত করা।

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা এ মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও তার বিশদ আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। যাতে আমরা ইসলামী শিক্ষাদানের পদ্ধতিসমূহ খুব সুন্দরভাবে আয়ত্ব করতে পারি। যেমন- আক্বীদা, ইবাদত, কুরআন, হাদীছ, ফিকহ্ প্রভৃতি।

কুরআনুল কারীম পাঠদানের পদ্ধতি

প্রথমতঃ কুরআনুল কারীম পাঠদানের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য :

ছাত্রদের বিশুদ্ধ তাজভীদ সহ পবিত্র কুআনের শিক্ষা দিতে হবে। যাতে তারা এর মধ্যকার আয়াতগুলোর মর্মার্থ বুঝতে পারে এবং এতে যে আদেশ-নিষেধ রয়েছে তার বাস্তবায়ন করতে পারে। এ অধ্যায়ের আলোচনার সারসংক্ষেপ নিম্নোক্ত হ'তে পারে।

১. মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে আমরা তার অর্থ বুঝতে ও অনুধাবণ করতে পারি এবং তার উপর আমল করতে পারি। মহান আল্লাহ বলেন, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا 'তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না? না-কি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ'? *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*।

২. পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো তেলাওয়াতের মাধ্যমে যাতে আল্লাহভীতি অর্জন করতে পারি এবং তার সম্মানে আমাদের অন্তরগুলো বিনয় অবনত হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ 'যারা মুমিন, তাদের জন্য কি আল্লাহ্র স্মরণে এবং যে সব অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি'? *(হাদীদ ৫৭/১৬)*।

৩. আমরা যাতে সুবিন্যস্ত ও সুস্পষ্টভাবে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতে পারি। যেমন মহান আল্লহ এরশাদ করেন, أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا 'আপনি সুবিন্যস্ত ও স্পষ্টভাবে কুরআন আবৃত্তি করুন' *(মুযযাম্মিল ৭৩/০৪)*।

অতঃপর হে সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী! পাঠদানের ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্যগুলো অবশ্যই আপনাদের বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নের উদ্দেশ্যগুলো অনুসরণ করা অত্যন্ত যরূরী। যেমন-

(ক) আপনি ছাত্রদের ছহীহ-শুদ্ধভাবে তাজভীদসহ কুরআন শিক্ষা দিবেন। এর জন্য আপনাকে খুব সুন্দর তাজভীদ সহকারে ও স্পষ্টকণ্ঠে নির্ভুলভাবে তাদের সামনে কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে।

(খ) ছাত্ররা যেন সাধ্যমত কুরআন পড়তে পারে তার অভ্যাস করান। এক্ষেত্রে আপনি বিভিন্ন তাফসীরের সহযোগিতা নিয়ে নিজে আগে ভালভবে অনুধাবণ করবেন। অতঃপর ছাত্রদের বিবেক-বুদ্ধির কাছে তুলে ধরবেন।

(গ) আপনার ছাত্ররা যখন কুরআন থেকে আল্লাহ্র শাস্তি সংক্রান্ত আয়তগুলো আবৃত্তি করবে, তখন তাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় দেখান। আর যখন তারা আল্লাহ্র রহমত সংক্রান্ত আয়াতগুলো পাঠ করবে, তখন তাদের সামনে আল্লাহ্র জান্নাতের সুখ-শান্তি ও তার রহমতের আলোচনা উল্লেখপূর্বক উৎসাহ প্রদান করুন। আর আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব সম্পর্কিত আয়াতের স্থানে তাদের বিনয়াবনত হওয়ার শিক্ষা দিন। তবে হ্যাঁ, এক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে আগে আদর্শ হতে হবে। যেমন- যখন আপনি তাদেরকে আল্লাহ্র বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের দিকে ইঙ্গিত করবেন, তখন সে ভাবটা আগে আপনার চেহারাতে ফুটিয়ে তুলুন, যাতে তারা সেদিকে লক্ষ্য করতে পারে। যখন তারা আপনাকে আল্লাহ্র ভয়ে ভীতু হ'তে দেখবে, তখন তারাও তা দেখে আপনার সাথে আল্লাহ্র ভয়ে ভীতু হবে। যখন তারা আপনার চেহারাকে হাস্যোজ্জ্বল দেখবে, তখন তাদের অন্তরগুলোও প্রশান্তি লাভ করবে এবং আল্লাহ্র প্রতিদানের প্রতি উৎসাহী হবে।

(ঘ) প্রত্যেকটি পাঠে আপনার ব্যক্তিগত ও ছাত্রদের কর্মজীবনের বাস্তবতার দিক লক্ষ্য করে সত্যবাদিতা, ইবাদত, জিহাদ, ধৈর্যধারণ প্রভৃতি বিষয়ে একটি সারসংক্ষেপ ও শিক্ষা দাড় করান।

দ্বিতীয়তঃ পবিত্র কুরআনুল কারীম পাঠদানের পদ্ধতি :

হে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ! কুরআনুল কারীম পাঠদানের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও এর মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা যরূরী।

(১) ভূমিকা উপস্থাপন করা :

আপনি আপনার পাঠদানের শুরুতেই একটি ভূমিকা উপস্থাপনা করুন। যাতে কুরআনের উদ্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি সহজেই ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ হয় এবং তা বুঝতে ও আয়ত্ব করতে উৎসাহী করে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে পারেন-

(ক) আয়াতের শানে নুযূল বা প্রেক্ষাপট উল্লেখ করা। যেমন আছহাবে উখদূদ বা গর্তওয়ালাদের ঘটনা উল্লেখ করা।
(খ) জীবনের কোন বাস্তবতা থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া, যা পাঠের আলোচ্য বিষয় থেকে সমাধান করা যায়। যেমন পিতার প্রতি আনুগত্যশীল সন্তান অথবা পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানের ঘটনার মত অনুরূপ ঘটনা উল্লোখ করা।
(গ) বর্তমান পাঠের সাথে পূর্বের পাঠের সম্পর্ক কি? তা ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করা এবং এ দু'য়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে দেওয়া। আর সর্বাবস্থায় অবশ্যই ছাত্রদের ছহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াতের কথা স্মরণ করাবেন। নিশ্চয় ফেরেশতামণ্ডলী তাদের তেলাওয়াতের সময় উপস্থিত থাকেন এবং আল্লাহ্র নিকট হুবহু তা উপস্থাপন করেন।

(ঘ) কুরআনের সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা, যা পরবর্তী ক্লাসের আলোচ্য বিষয় হবে। তারপর ছাত্রদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পাঠ বা ক্বিরাআত শ্রবণের সময় তারা ঘটনা থেকে কি বুঝল তা জিজ্ঞেস করা। আর এভাবেই ছাত্ররা শারীরিক ও মনস্তাত্বিক দিক দিয়ে পাঠের প্রতি মনোযোগী হবে এবং তাদের জন্য ব্যাখ্যা করা ও বুঝানো বিষয়গুলো সহজেই গ্রহণ করতে পারবে।

(২) তেলাওয়াতের নমুনা :

যখন ক্লাসে সব ছাত্রদের সামনে কুরআন থাকবে না, তখন প্রয়োজনীয় অংশটুকু ব্লাকবোর্ডে লিখে দিন। অতঃপর এ পাঠের প্রয়োজনীয় অংশটুকু তাজভীদ সহ উচ্চ আওয়াযে এমনভাবে ছাত্রদের পাঠ করে শুনিয়ে দিন, যাতে সবাই শুনতে পায়। আর তাদের প্রাথমিক শিক্ষার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে আপনি প্রথমবার একাকী পাঠের পর বারবার পুনরাবৃত্তি করতে বলুন। সাথে সাথে তাদেরকে কুরআন শ্রবণের শিষ্টাচারও শিক্ষা দিন। এরপর ব্লাকবোর্ডে বা পাঠ্যবইয়ের লিখিত আয়াতের শব্দগুলো 'আঊযুবিল্লাহ' ও 'বিসমিল্লাহ' বলার মাধ্যমে পাঠদান করুন। এভাবে ছাত্রদের শুরু করতে বলবেন। এবার ভূমিকার আলোকে তাদের সাধ্যমত আপনার অনুসৃত পদ্ধতি দ্বারা শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করুন এবং প্রয়োজনীয় অর্থগুলো বুঝিয়ে দিন।

(৩) ব্যাখ্যা উপস্থাপন :

[শিক্ষকমণ্ডলী পঠিতব্য আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্তাকারে ছাত্রদেরকে বুঝিয়ে দিবেন। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সামনে রাখা যেতে পারে-অনুবাদক]

(ক) মূল পাঠ্য থেকে মৌলিক একটি অনুচ্ছেদ বা অর্থসহ কিছু অংশ নির্দিষ্ট করুন এবং তা ভূমিকার সাথে সংযুক্ত করে উপস্থাপন করুন।

(খ) ব্যাখ্যার প্রয়োজন এমন গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলো ব্যাখ্যা করে দিন এবং (প্রয়োজনে) তা ব্লাকবোর্ডের এক পাশে লিখে দিন। প্রয়োজনে মুখে মুখে স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করে দিন।
(গ) যখন দারসটি শুধু তেলাওয়াতমূলক হবে, তখন শুধু মৌলিক শব্দগুলোর অর্থ করা এবং প্রয়োজনীয় কিছু কিছু শব্দের ব্যাখ্যা করে দেওয়ার মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ থাকবেন।

(ঘ) কিন্তু যখন পাঠটি মুখস্থ করানো উদ্দেশ্য হবে, সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটি আয়াত ছাত্রদের ব্যাখ্যা করে দিবেন এবং তারা কতটা বুঝল জিজ্ঞেস করবেন।

(৪) পাঠ থেকে শিক্ষা ও কর্মের সাথে তার সামঞ্জস্যতা বুঝিয়ে দেওয়া :

(ক) মূল পাঠ থেকে একটি শিক্ষা দাড় করান এবং ছাত্রদের নিকট থেকে তাদের জীবনের চলার পথে তা বাস্তববায়ন করবে মর্মে অঙ্গীকার নিন। বাস্তবিক জীবন থেকে তাদের সামনে দৃষ্টান্ত তুলে ধরুন এবং এটা বাস্তবায়নের জন্য তাদের পরিকল্পনা ও দৃঢ়তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে নিন, ভবিষ্যতে তারা কিভাবে তা বাস্তবায়ন করবে, সেটাও স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিন।
(খ) সুবিন্যস্ত ও স্পষ্টভাবে তেলাওয়াত ও মুখস্থকরণ :

(১) সুবিন্যস্ত ও বিশুদ্ধভাবে মূল পাঠের তেলাওয়াত ছাত্রদের সামনে উপস্থাপন করবেন এবং ছাত্রদেরকে দলবদ্ধভাবে আপনার সাথে বারবার তেলাওয়াত করতে বলবেন।

(২) ছাত্রদের প্রত্যেককে এককভাবে তেলাওয়াত করতে বলবেন এবং তাদের ভুলগুলো সংশোধন করে দিবেন। তবে ভুল সংশোধনের সময় বারবার তাদের কাছ থেকে ভুল শব্দটি উচ্চারণ করে নিন, যাতে ভালভাবে তাদের অন্তরে গেথে যায়। এক্ষেত্রে ব্যবহারিক পদ্ধতিতেও তাদের ভুলগুলো শুধরিয়ে দিতে পারেন। (যেমন কুরআনের শর্তযুক্ত ব্যাখ্যাগুলো নিয়ে তাদের ব্যবহারিক কাজ দিতে পারেন)।

(৩) পরস্পরের শ্রবণের পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে যে সমস্ত ছাত্র খুব ভালভাবে পাঠ মুখস্থ করেছে তার নিকট থেকে তা শ্রবণ করুন, তার ভুলগুলো শুদ্ধ করে দিন এবং তাদেরকে পাঠের প্রতি অনুপ্রাণিত করুন। পাঠের জন্য বাহবা দিন। তাদের পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ করান।

(গ) ছাত্রদের বাড়ীর কাজ দিন। তাদেরকে নির্দিষ্ট পাঠ বাড়ী থেকে মুখস্থ করে আসতে বলবেন। যাতে পরবর্তী ক্লাসে তাদের নিকট জিজ্ঞেস করতে পারেন। পাশাপাশি তাদেরকে বাড়ীতে কুরআনের তা'লীম দিতে বলবেন এবং সর্বশেষ তাদের চলাফেরা কার্যক্রম সম্পর্কে মাঝে মাঝে পরিবারের লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করে নিবেন।

হাদীছ পাঠদানের পদ্ধতি

হাদীছের সংজ্ঞা : হাদীছ বর্ণনাকারীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কাজ, সম্মতি, কোন কিছু পরিহার, তার গুণাবলী, চরিত্র ইত্যাদি বিষয়ে যা বর্ণনা করেছেন তাই হাদীছ। যা আমাদের সামনে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনের বৈশিষ্ট্য ও কুরআনের শিক্ষার সাথে তার তুলনা এবং মানবজীবনের জন্য আল্লাহ্র অর্পিত বিধি বিধানের বর্ণনা তুলে ধরা।

হাদীছ পাঠদানের উদ্দেশ্য :

(১) মহান আল্লাহ তাঁর প্রেরিত রাসূল (ছাঃ)-কে বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরণ করেছেন, যাতে মানুষরা তাঁর অনুসরণ করে ও তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীছ এবং আদেশ-নিষেধের উপর পূর্ণ আমল করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ 'বস্তুতঃ আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহ্র নির্দেশানুযায়ী তাদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়' *(নিসা ৪/৬৪)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা' *(হাশর ৫৯/৭)*।

তাই বলা যায়, হাদীছ পাঠের মূল উদ্দেশ্য হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করা, তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীছের উপর আমল করা এবং আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর বাস্তবায়ন করা। কেননা তাঁর আনুগত্য করা অর্থ আল্লাহ্রই আনুগত্য করা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ 'যে রাসূলকে অনুসরণ করল সে মূলত আল্লাহ্রই অনুসরণ করল' *(নিসা ৪/৮০)*।

যাতে আমরা 'মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল' এ সাক্ষ্যকে আমলের মাধ্যমে সত্যয়ন করতে পারি। যা আল্লাহ্র নিকট আমরা যে রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম, তাকে সত্যবাদী হিসাবে মেনে নিয়েছিলাম এবং কেবল তাকেই অনুসরণ করে চলেছিলাম এ সাক্ষ্য বহন করবে। আর এর মাধ্যমে আমরা ক্বিয়ামতের মাঠে তার হাউযে কাউছার থেকে পানি পানে তৃপ্ত হয়ে তার পতাকাতলে সমবেত হ'তে চাই।

(২) মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কুরআনের ভাষ্যকর হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 'আর আমি আপনার নিকট স্মরণিকা প্রেরণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে' *(নাহল ১৬/৪৪)*। যেমন ছালাতের বর্ণনা পবিত্র কুরআনে সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তার রাক'আত সংখ্যা, সময়সূচী, আদায়ের পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। একইভাবে যাকাতের পরিমাণ, হজ্জের হুকুম-আহকাম সহ সকল ইবাদত ও ফিকহের বিধি-বিধানের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এছড়াও রাসূল (ছাঃ) আমাদের জন্য বিভিন্ন কুরআনী ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন মূসা, খিযীর, ইবরাহীম, ইসমাঈল (আঃ) প্রমুখ নবী-রাসূলদের কাহিনী নববী পন্থাতে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন, যা খুব সহজেই পাঠকেরা বুঝতে পারে।

(৩) মহান আল্লাহ তার নবীকে কুরআন ও হিকমাহ তথা সুন্নাহ দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ 'আমাকে কুরআন ও এর সমপরিমাণ তথা হাদীছ দান করা হয়েছে' *(আবুদাঊদ হা/৪৬০৪; মিশকাত হা/১৬৩, সনদ ছহীহ)*। অতঃপর হাদীছ পাঠদানের তৃতীয় উদ্দেশ্য হ'ল, কুরআনে পাওয়া যায় না এধরণের যে বিধানগুলো রাসূল (ছাঃ) আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন তার অনুসরণ করব, যাতে এর দ্বারা আমরা দ্বীনকে পরিপূর্ণ করতে পারি এবং শরী'আতকে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারি।

হাদীছ পাঠদানের পর্যায়/পদ্ধতি :

[হাদীছ ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস। এর পাঠ শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত যরূরী। হাদীছ পাঠদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পর্যায় বা পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে- অনুবাদক]

১. ভূমিকা উপস্থাপন করা :

আপনি একজন হাদীছের শিক্ষক হিসাবে পাঠদানের পূর্বে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা রাখুন, যা ছাত্রদের হাদীছ শ্রবণ ও বুঝতে উৎসাহ যোগাবে। ভূমিকা হিসাবে আপনি নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে পারেন :

(ক) ছাত্রদের উদ্দেশ্যে জীবনের দুর্বিষহ বাস্তবতা থেকে এমন কোন ঘটনা উল্লেখ করুন, এই হাদীছ যার সমাধান হ'তে পারে।

(খ) তাদের জানা কুরআন বা আক্বীদা সংক্রান্ত কোন বিষয় তাদের সামনে তুলে ধরুন, যা আলোচ্য হাদীছের পাঠ্য বিষয় হবে। ফলে এ জানা তাকে আরো প্রশস্ততা ও পূর্ণতা এনে দেয়। অথবা তাদের পাঠগুলোর একটির সাথে আরেকটির সম্পর্ক মিলিয়ে দিন।

(গ) আপনার যদি হাদীছের প্রেক্ষাপট জানা থাকে, সেক্ষেত্রে তা হাদীছ পাঠের ভূমিকাতে উল্লেখ করুন।

(ঘ) আলোচ্য হাদীছ বুঝা ও এর অর্থ নিয়ে গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তার দিকে ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করার মাধ্যমে ভূমিকার পরিসমাপ্তি টানুন। প্রয়োজনে তা তাদের লিখিয়ে দিন।

২. মূল পাঠ উপস্থাপন করা :

(ক) মূল হাদীছ হারাকাত সহ স্পষ্টভাবে পরিচিত লিপিতে ব্লাকবোর্ডের উপর লিখে দিন। আর ব্যাখ্যা করার জন্য পাশে কিছু খালি জায়গা রাখুন। লেখার সময় উচ্চারণ করে পড়তে থাকুন, যাতে ছাত্ররা বুঝার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে এবং মনে মনে হাদীছের শব্দগুলো মুখস্ত করতে পারে।

(খ) হাদীছকে স্পষ্টভাবে পাঠ করুন, যাতে সহজেই অর্থ প্রকাশ পায়। যেমন রাসূল (ছাঃ) যখন খুৎবা দিতেন তখন তাঁর আওয়াজ উঁচু হত, তাঁর চোখগুলো লাল হয়ে যেত, যেন তিনি কোন সৈন্য বাহিনীকে সতর্ক করছেন। এছাড়া আপনি আপনার ছাত্রদের নিকট হাদীছকে এমন স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করবেন, যাতে করে হাদীছ বুঝার উদ্দীপনাকে তাদের আরো প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে ছাত্রদের প্রয়োজন মনে করলে পাঠকে পুনরাবৃত্তি করবেন।

(গ) হাদীছের প্রত্যেকটি শব্দ ব্যাখ্যা করে দিন। তারা সহজেই বুঝতে পারবে এমন পদ্ধতিতে সেগুলোর অর্থ করে দিন এবং ব্লাকবোর্ডের একপাশে এর অর্থ লিখে দিন।

(ঘ) ছাত্ররা সহজেই বুঝতে পারে এমন পদ্ধতি ও ভাষাতে হাদীছের সাধারণ অর্থগুলোকে পুনরায় ব্যাখ্যা করে দিন।

(ঙ) ছাত্ররা যাতে ব্যাখ্যার আলোকে হাদীছ বুঝতে পারে, এজন্য প্রয়োজনে হাদীছটিকে পুনরায় পাঠ করে শুনিয়ে দিন।

(চ) বেশ সংখ্যক ছাত্রের কাছ থেকে হাদীছটি বারবার পড়িয়ে নিন, যাতে কোন প্রকার অস্পষ্টতা ছাড়াই হাদীছের শব্দগুলো তারা আয়ত্ব করতে পারে। এসময় তাদের ভুলগুলো ভালভাবে ধরিয়ে দিন।

(ছ) হাদীছের বিধি-বিধানগুলো বের করে মূল হাদীছের পাশে বা নীচে লিখে দিন। এক্ষেত্রে হাদীছের প্রত্যেকটি বাক্য থেকে কি উপকারিত ও বিধি-বিধান রয়েছে তা ছাত্রদের জিজ্ঞেস করে জেনে নিন। এরপর তাদের দেওয়া উত্তরগুলো ব্যাখ্যা করে দিন এবং ভুল থাকলে সংশোধন করে দিন। অতঃপর এই হাদীছ থেকে একটি অনুচ্ছেদ বা সারসংক্ষেপ লিখে দিন। আর এভাবেই একের পর এক অন্যান্য বিষয়গুলো শেষ করুন।

৩. ফলাফল ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন :

(ক) আপনি ছাত্রদেরকে তাদের জীবনের বাস্তবতা থেকে এমন কোন প্রেক্ষাপট উল্লেখ করতে বলুন, এ হাদীছ দ্বারা যার সমাধান করা যায়। তাদের কাছ থেকে জেনে নিন এহেন প্রেক্ষাপটে তারা কিভাবেই এ হাদীছ দ্বারা তারা সমাধান করবে?

(খ) তাদের সামনে সামাজিক কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরুন এবং তার সমাধানের পদ্ধতি জিজ্ঞেস করুন অর্থাৎ আলোচ্য হাদীছ দ্বারা কিভাবে তারা সেই সামাজিক সমস্যাকে প্রতিরোধ করতে পারে? আর এভাবেই যেন তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও সমাজ সংস্কারে হাদীছের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে।

(৪) বাড়ীর কাজ দিন :

(ক) পরবর্তী ক্লাশের জন্য হাদীছ মুখস্ত করতে বলা।

(খ) হাদীছের অর্থ বুঝা ও ব্যাখ্যাকে পুনরায় ভালভাবে পড়ে আসতে বলা।

(গ) পূর্ণরূপে পরবর্তী ক্লাসে হাদীছ বুঝে আসতে বলা।

(ঘ) সম্ভবপর হ'লে সংশ্লিষ্ট হাদীছটির বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর লিখে আনতে বলা।

আক্বীদা ও তাওহীদ পাঠদানের পদ্ধতি

আক্বীদার সংজ্ঞা : 'ফিকহুল ইসলামী'-এর পরিভাষা অনুযায়ী আক্বীদা হ'ল,

هِيَ مَا اسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ فَآمَنَ بِهِ إِيْمَانًا مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ ثَابِتًا بِالدَّلِيْلِ كَالْإِيْمَانِ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَكُتُبِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ.

'আক্বীদা হ'ল, অন্তরের স্থির বিশ্বাস। দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ের উপর বাস্তবতার আলোকে বিশ্বাস স্থাপন করাই আক্বীদা। যেমন- আল্লাহ, পরকাল, আল্লাহ্র কিতাব সমূহ, রাসূল প্রভৃতি বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা'।

বিবেক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আক্বীদার উৎপত্তি :

তারকা, সূর্য, চন্দ্র, রাত, দিন, আসমান, যমীন, উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষ, আলো-বাতাস, বৃষ্টি ও সৃষ্টি জগতকে বেষ্টন করে থাকা যাবতীয় শৃঙ্খলা, বৈচিত্র, অকাট্য বিধান, সৃষ্টি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, এ বিশ্ব জগতের একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন, যিনি চিরঞ্জীব, আপন ক্ষতাবলে প্রতিষ্ঠিত, তিনি এর পরিকল্পনাকারী, সৃষ্টিকর্তা, মহাজ্ঞানী, অমুখাপেক্ষী, একক সত্তা, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি।

এর বড় প্রমাণ হ'ল- এ পৃথিবীর সকল সৃষ্টি অন্যের অধিন্যস্ত ও মুখাপেক্ষী। কিছু সময়ের জন্য তারা স্থায়ী থাকে আবার

এক সময় ধ্বংস হয়ে যায়। তারা অন্যের উপকার সাধন বা ক্ষতি দূর করা তো দূরের কথা নিজের ক্ষতি প্রতিহত করতেই সক্ষম নয়।

এ সৃষ্টি জগৎ একাকী সৃষ্টি হয়নি, কোন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এর সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্যই তার জন্য মহান বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মহাপরাক্রমশালী একজন সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন, যার নিদর্শন এ সৃষ্টি জগতেই রয়েছে। তাঁর আরও প্রমাণ হ'ল তিনি সকল সৃষ্টির উপর বিজ্ঞানময়, উপকার বা ক্ষতি করার যাবতীয় শক্তির উপর শক্তিধর। তিনি সৃষ্টিকূলের রিযিকদাতা, জীবনের অধিপতি, তিনি প্রত্যেকের সৃষ্টিকর্তা, তার দিকেই সকল সৃষ্টি প্রত্যাবর্তিত হবে। একমাত্র তিনিই সকল রূপক হিসাব গ্রহণকারীদের হিসাবগ্রহণকারী।

অতএব মানবজাতি যখন এ সকল সৃষ্টি জগতের চেয়ে উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার, তখন আমাদের জন্য যরূরী হ'ল আমাদের জীবন যেন আল্লাহ্র ভালবাসার সাথে যুক্ত থাকে। তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন, আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান পালনের ব্যাপারে বিনয় অবনত হয়। আর আমাদের চলাফেরা ও সকল কাজকর্ম যেন কেবল সমাজে তাঁর ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা ও বিনয়াবনত হওয়ার উদ্দেশ্যই হয়। যেন লোকেরা তাদের রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, যাদের কেবল আমাদের হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হওয়া কুরআনের বিধি-বিধান যেন তারা প্রতিদানের আশা নিয়ে ক্বিয়ামতের ময়দানে পরিণামের ভয় নিয়ে বাস্তবায়ন করে। যেদিন আল্লাহ সকল সৃষ্টিকে একত্র করে তাদের আমলের হিসাব অনুযায়ী বদলা দিবেন। মহান আল্লহ বলেন, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ– وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ 'আর কেউ অনু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি অনু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*।

আক্বীদা ও তাওহীদ পাঠদানের বৈশিষ্ট্য :

পাঠের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য জানা না থাকলে একটি পাঠদান কোন ব্যক্তির পক্ষে কখনোই ফলপ্রসূ হয় না এবং যতক্ষণ না সে উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করা হয়। আক্বীদা পাঠদানের বেশ কিছু লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য রয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল :

(১) ছাত্রদের বিশুদ্ধ আক্বীদা শিক্ষা দেওয়া, যা তাদের আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা করবে এবং মৌলিক ঈমানের শিক্ষা দেওয়া, সৎ আমল, আল্লাহ্র আনুগত্যর ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যায়ী হওয়া, তাদের জ্ঞানকে ঈমানের আলো দ্বারা আলোকিত করা ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয় কুরআনী পদ্ধতি অর্থাৎ এগুলো সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ সাপেক্ষ বিষয়।

(২) ছাত্রদের জ্ঞানকে সব ধরণের শিরক, বিদ'আতী বিশ্বাস তথা জাদু টোনা বিশ্বাস, লক্ষণের দ্বারা ভাগ্য গণনা, আল্লাহ্র দ্বীন ছাড়া অন্য বিষয়ের উপর বিনয় হওয়া, তাঁর শরী'আত বহির্ভূত আমল করা ইত্যাদি বিষয় থেকে স্বচ্ছ ও পবিত্র রাখা।

(৩) ছাত্রদের বিবেক, ইচ্ছা, জীবন পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়কে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, তাঁর ইবাদত করা, শরী'আত বাস্তবায়ন, তাঁর আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে বিনয় হওয়া, তাঁর শাস্তির ব্যাপারে ভয় করা, তার সাক্ষাৎ ও জান্নাত লাভের জন্য খুশী হওয়া, তাঁর নির্দেশনাবলী নিয়ে গবেষণা করা, তার বর্ণনা থেকে তাঁর বড়ত্বের প্রমাণ নেওয়া এবং তাঁর কিতাবের প্রতি, রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ইত্যাদি বিষয়ের আলোকে প্রশিক্ষিত করে তোলাও আক্বীদা শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য। যাতে তারা বিশ্বাসী বিবেক নিয়ে গবেষণা করতে পারে, বিশ্বাসী পার্শ্ব দ্বারা অনুভব করতে পারে এবং সুদৃঢ় ইচ্ছা ও বিশ্বাস শক্তি নিয়ে কাজ করতে পারে।

(৪) ছাত্রদেরকে বিশ্বজগৎ, তার জীব-বৈচিত্র, সূচনা, প্রত্যাবর্তনস্থল এবং মানুষ সম্পর্কে পরিপূর্ণ একটি রূপরেখা প্রদান করা। যেমন- কেন আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল কোথায়, এ জীবনে তাদের কি কর্তব্য, ক্বিয়ামত, ফেরেশতা, আম্বিয়ায়ে কেরামগণ, আল্লাহ্র উল্যূহিয়াহ, রুবূবিয়্যাহ, আল্লাহ্র গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যা ব্যতীত ঈমান পরিপূর্ণ হয় না ইত্যাদি বিষয়ে একটি রূপরেখা তুলে ধরা। মানব জীবনে আল্লাহ্র প্রেরিত রিসালাহ্র গুরুত্ব, যার মাধ্যমে এ সৃষ্টি জগতে একজন মুসলিম তার অস্তিত্ব ও মর্যাদার পরিচয় লাভ করতে পারে এবং মানুষকে আল্লাহ সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছেন তার একটা চিত্র তুলে ধরা। যাতে একজন মুসলিম তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে ইসলামের এসকল মৌলিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে পারে। *(চলবে)*

[লেখক : সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; ছাত্র, চতুর্থ বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ

ইমাম বুখারী (রহঃ) ইবনু আবী লায়লার বরাত উল্লেখ করে বলেন,

'হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) তখন মাদায়েনের শাসক। তিনি পানি পান করতে চাইলে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রূপার পাত্রে তাঁকে পানি এনে দিল। তিনি তা তার মুখে ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, আমি এমনি এমনি তাকে ছুঁড়ে মারিনি। এর আগেও আমি তাকে নিষেধ করেছি, কিন্তু সে নিষেধ মানিনি। অথচ নবী করীম (ছাঃ) আমাদের মসৃণ রেশম ও মোটা রেশমের কাপড় পরতে এবং সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, ওগুলো দুনিয়াতে তাদের জন্য এবং পরকালে তোমাদের জন্য *(বুখারী হা/৫৬৩২)*।

আলোকপাত

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

প্রশ্ন (০১/৮১) : 'মুরজিয়া তরীকা সম্পর্কে জানতে চাই?

-রাশেদুল ইসলাম, মোল্লাপাড়া, রাজশাহী

উত্তর : মুরজিয়া অর্থ বিলম্ববাদী, শৈথিল্যবাদী। আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর দ্বন্দ্বের সময় এরা উভয় পক্ষকে মুমিন গণ্য করে নিরপেক্ষ ছিল। তাদের সকলকে স্ব স্ব আমলের উপর ছেড়ে দিয়েছিল। তারা আমলকে ঈমান থেকে পৃথক ভেবে শিথিলতা প্রদর্শন করেছিল। সে জন্য তাদেরকে মুরজিয়া বলা হয় *(আল-মিলাল ওয়ান নিহাল ১/১৩৮ পৃঃ)*। এটি জাহান্নামী ফের্কা বলে রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন *(ত্বাবারাণী, আল-আওসাত্ব হা/৪২০৪, সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৪৮)*।

প্রশ্ন (০২/৮২) : ক্রমবিকাশ ও গতিধারা বিবেচনায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-কে কয়টি যুগে বিভক্ত করা যায়?

-আব্দুর রাযযাক, চারঘাট, রাজশাহী

উত্তর : ক্রমবিকাশ ও গতিধারা বিবেচনায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-কে ছয়টি যুগে বিভক্ত করা যায় । ১. স্বর্ণযুগ (-৩৭ হিঃ পর্যন্ত) ২. বিদ'আতীদের উত্থানযুগ (৩৭-১০০ হিঃ) ৩. সংকট ও সংস্কারের যুগ (১০০-১৯৮ হিঃ) ৪. সুন্নাত দলনের যুগ (১৯৮-২৩২ হিঃ) ৫. সংকট পরবর্তী যুগ (২৩২-৪র্থ শতাব্দী হিঃ) ৬. তাক্বলীদী যুগ (৪র্থ শতাব্দী হিজরী হ'তে পরবর্তী যুগ) *(আলহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৮৩-৮৪)*।

প্রশ্ন (০৩/৮৩) : নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহঃ)-এর মৃত্যুবরণের ঐতিহাসিক ঘটনা কি, যা বর্তমান গবেষকদের অনুপ্রেরণা যোগায়?

-সাইফুর রহমান, রংপুর

উত্তর : ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ মোতাবেক ১৩০৭ হিজরীর ২৯ শে জমাদিউছ ছানী বুধবার দিবাগত রাত ১-৩৫ মিনিটে ৫৮ বছর বয়সে এই মহান যুগ সংস্কারক-এর জীবনাবসান ঘটে।

মৃত্যুর ঘটনা : অন্যতম শিষ্য মাওলানা যুলফিকার আহমাদ ভূপালী (মৃঃ ১৯২১ খ্রিঃ) বলেন, নওয়াব ছাহেবের জীবনের শেষ রচনা ছিল সাইয়িদ আবদুল কাদের জীলানী (৪৭০-৫৬১ হিঃ)-এর বিখ্যাত বই 'ফুতূহুল গায়েব'-এর অনুবাদ গ্রন্থ 'মাক্বালাতুল ইহসান'। বইটির মুদ্রণ সংশোধনীর সময়ে নওয়াব ছাহেব মৃত্যুরোগে শয্যাশায়ী হন। লেখার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। ফলে তাঁর নির্দেশ মোতাবেক যোহর হ'তে আছর পর্যন্ত এবং এ'শার পর থেকে রাতভর তাঁর শয্যার সম্মুখে চেরাগ জ্বালিয়ে লেখনীর কাজ করতাম। সারারাত তিনি ঘুমাতেন না। তাঁর কষ্ট দেখে আমি চলে আসতে চাইলে তিনি বলতেন, 'মানুষ দু'প্রকার : একপ্রকার ঔষধের ন্যায়, যা প্রয়োজনের সময় লাগে। আর এক প্রকার খাদ্যের ন্যায়, যা সমসময় প্রয়োজন হয়। তুমি আমার নিকটে ২য় প্রকারের মানুষ'। অতঃপর যেদিন তাঁর বই ছাপা হয়ে গেল, সেদিন আমি দ্রুত এশার ছালাতের পরপরই এসে তাঁর খবর দিলাম। তিনি খুবই খুশী হলেন। ঔষধ মুখে দিলেন না। হঠাৎ টুপিটা মাথা থেকে পড়ে গেল। পা দু'খানা বিছিয়ে দিলেন। এমতাস্থায় আমার চোখের সামনেই এই ইলমী মহীরূহ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন!- *(দ্র. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৪৪-৩৬১)*।

প্রশ্ন (০৪/৮৪) : আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর সুন্নাতের প্রতি প্রত্যাবর্তনের বিখ্যাত ঘটনা জানতে চাই।

-ওলীউর রহমান, নারায়ণগঞ্জ

উত্তর : ওমর ফারূক (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (১৩-২৩ হিঃ) ইরাকের কূফায় খেলাফতের পক্ষ হতে রাষ্ট্রীয় শিক্ষক ও রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বশীল থাকা অবস্থায় দু'টি বিষয়ে তিনি স্বীয় রায় অনুযায়ী ফৎওয়া দেন। এটি হল (ক) প্রথম ফৎওয়া : জনৈক ব্যক্তি বিয়ের পরে তার শ্বাশুড়ীকে দেখে মুগ্ধ হয় এবং শ্বাশুড়ীকে বিয়ে করার জন্য (মিলনের পূর্বেই) স্ত্রীকে ত্বালাক্ব দেয়। এই বিয়ে সিদ্ধ হবে কি-না জিজ্ঞেস করা হলে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, এতে আর দোষ কি। একথা শুনার পর লোকটি উক্ত মহিলাকে (পূর্বতন শ্বাশুড়ীকে) বিয়ে করে এবং কয়েকটি সন্তান লাভ করে'। (খ) ২য় ফৎওয়া : (কূফাতে) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) রাষ্ট্রীয় বায়তুল মালের রৌপ্য স্থানীয় মুদ্রা ব্যবসায়ীদের নিকটে বিক্রি করতেন। তিনি বেশী দিয়ে বিনিময়ে কম নিতেন। অতঃপর ইবনু মাসঊদ (রাঃ) মদীনায় এলেন। তিনি উক্ত বিষয়ে দু'টি সম্পর্কে ছাহাবায়ে কেরামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন। প্রথমটির ব্যাপারে তাঁরা বিয়ে সিদ্ধ না হওয়ার কথা বললেন। দ্বিতীয়টির ব্যাপারে বললেন, 'সমান সমান ওযনে ব্যতীত রৌপ্য বিনিময় সিদ্ধ নয়'।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং (কূফায়) ফিরে এসে প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে খোঁজ করলেন। কিন্তু না পেয়ে অবশেষে তার গোত্রের নিকটে গেলেন ও তাদেরকে ডেকে বললেন, 'আমি যে ব্যক্তিকে তার পূর্বতন শ্বাশুড়ীকে বিয়ে করার ফৎওয়া দিয়েছিলাম ঐ বিয়ে সিদ্ধ হয়নি'। অতঃপর মুদ্রাবাজারে গিয়ে ব্যবসায়ীদের ডেকে বললেন, 'ওহে ব্যবসায়ীগণ! তোমাদের সঙ্গে ইতিপূর্বে যে কারবার আমি করেছি তা সিদ্ধ হয়নি। কেননা সমান সমান ওযন ব্যতীত রৌপ্য বিনিময় সিদ্ধ নয়' *(ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্বক্বিঈন ২/২৮২-৮৩ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (০৫/৮৫) : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার পরে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে, যারা প্রত্যেকেই নিজেকে 'আল্লাহ্র নবী' ধারণা করবে। অথচ আমিই শেষ নবী। আমার পরে নবী নেই' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কী ছীহ?

-আব্দুল্লাহ মাসঊদ, খুলনা

উত্তর : হ্যাঁ, হাদীছটি ছহীহ *(আবূদাঊদ হা/৫৪৫২ 'ফিৎনা ও হৃদয় আকৃষ্টকারী বক্তব্য' অধ্যায়-২৯, 'ফিৎনার আলোচনা ও তার প্রমাণ সমূহ' অনুচ্ছেদ-১; হাকেম হা/৮৩৯০; মুসনাদে আহমাদ হা/২২৪৪৮; মিশকাত হা/৫৪০৬ 'ফিৎনা' অধ্যায়, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ; ছহীহুল জামে' হা/১৭৭৩, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (০৬/৮৬) : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর চতুর্থ দফা কর্মসূচী 'তাজদীদে মিল্লাত' বা সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য ও করণীয় কি জানতে চাই

-মিনহাজুল ইসলাম, রাজশাহী

উত্তর : করণীয় হ'ল, আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান অনুযায়ী সমাজের বুকে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং এর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সংশোধনের ব্যবস্থা করা।

উদ্দেশ্য হ'ল, এটিই মুসলিম জীবনের প্রধান কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি; তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করার জন্য' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। সমাজের বুক হতে অন্যায় ও কুসংস্কার দূর করার নামই হল সমাজ সংস্কার। কিন্তু এই অন্যায় ও কুসংস্কারের মাপকাঠি কি?

যুগে যুগে বিভিন্ন মানবরচিত ধর্ম, মতবাদ, সামাজিক প্রথা, দেশীয় রীতিনীতি ও শাসক সম্প্রদায়ের গৃহীত নীতিমালাকেই ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। আর এসবের বিরোধিতাকেই অন্যায় বা কুসংস্কার বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ মানুষের রচিত আইন-কানুন অবশ্যই ত্রুটিপূর্ণ হওয়া স্বাভাবিক। আর এসব ত্রুটিপূর্ণ আইন দিয়েই সমাজের ত্রুটি দূর করার ব্যর্থ প্রয়াস চালানো হচ্ছে। কিন্তু মুসলিম হিসাবে একথা আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, কেবলমাত্র আল্লাহ্র 'অহি' অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধানই অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস এবং ন্যায়-অন্যায়ের একমাত্র মানদণ্ড। এর বিরোধী যাই-ই হবে, তাই-ই অন্যায় ও কুসংস্কার বলে বিবেচিত হবে। আর তা দূর করার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে হবে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অন্যায় ও কুসংস্কার বাসা বেঁধে আছে। এর পূর্ণ মূলোৎপাটন সম্ভব না হলেও সাধ্যমত সংস্কারের প্রচেষ্টা চালানো আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। তাই বর্তমান অবস্থায় সমাজ সংস্কারে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিতে চাই। যথা : (১) শিক্ষা সংস্কার (২) অর্থনৈতিক সংস্কার (৩) নেতৃত্ব সংস্কার *(কর্মপদ্ধতি, পৃঃ ৩৫-৩৬)*।

প্রশ্ন (৭/৮৭) : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর যেলা কমিটি গঠনের নিয়ম-পদ্ধতি জানতে চাই।

-হাফীযুর রহমান, সিরাজগঞ্জ

উত্তর : (ক) প্রতিটি সরকারী যেলা অথবা 'কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ'-এর অনুমোদন সাপেক্ষে বিশেষ অঞ্চল সমূহ নিয়ে একটি 'সাংগঠনিক যেলা' গঠিত হবে। (খ) কেন্দ্রীয় সভাপতি স্বীয় কর্মপরিষদ, সংশ্লিষ্ট যেলার উপদেষ্টা পরিষদ ও উপযেলা সভাপতিদের সাথে পরামর্শক্রমে যেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনয়ন দেবেন। উক্ত তিনজন কেন্দ্রীয় সভাপতি বা তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতি ও পরামর্শক্রমে অনধিক ১০ (দশ) সদস্যের পূর্ণাঙ্গ 'যেলা কর্মপরিষদ' গঠন করবেন এবং শপথ নিবেন। (গ) প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করার জন্য কেন্দ্রীয় সভাপতি একজনকে আহ্বায়ক, একজনকে যুগ্ম আহ্বায়ক ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি 'যেলা আহ্বায়ক কমিটি' গঠন করতে পারেন। যার মেয়াদ অনধিক ছয় মাস হবে। (ঘ) 'কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ'-এর অনুমোদন সাপেক্ষে যেলা শহর অথবা যেলার কোন সুবিধাজনক স্থানে 'যেলা কার্যালয়' স্থাপিত হবে। (ঙ) সিটি কর্পোরেশন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ যেলার মান পাবে। (চ) ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট যেলা কর্মপরিষদ সদস্যের পদ হ'ল : সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, অর্থ সম্পাদক, প্রচার সম্পাদক, প্রশিক্ষণ সম্পাদক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও দফতর সম্পাদক *(বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর গঠনতন্ত্র, পৃঃ ১১-১২)*।

প্রশ্ন (৮/৮৮) : আমি নিয়মিত জুম'আর খুৎবা দেয়। মসজিদে বিভিন্ন ধরণের মুছল্লী উপস্থিত থাকে। সেখানে কেউ বৈষয়িক জীবনের অনুসারী থাকে, আবার কেউ ছালাতই আদায় করে না কিংবা আধুনিক সভ্যতার দোহায় দিয়ে জীবন-যাপন করে থাকে। এক্ষুণে মসজিদের মুছল্লীদেরকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনতে কোন্ কোন্ বিষয় এবং কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে দয়া করে পরামর্শ জানাবেন।

-রেযাউল করীম, ময়মনসিংহ

উত্তর : ভাই! দুনিয়ার সবাই একসাথে আল্লাহমুখী হবে, বিষয়টি এমন না। এখানে কিছু মানুষ থাকবে যারা সর্বদা বৈষয়িক জীবনকে প্রাধান্য দিবে, আবার কেউবা আধুনিকতার দোহায় দিয়ে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোকে অমান্য করে কিংবা বিভিন্ন কৌশলে শরী'আতকেই অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করে। তাই বিষয়টি মাথায় রেখে লোকদের আল্লাহমুখী করতে প্রথম প্রয়োজন তাদের অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করা। আপনি জুম'আর খুৎবায় ধারাবাহিকভাবে পরহেযগারিতা, হালাল রূযী, সূদ-ঘুষের ভয়াবহ পরিণতি, জান্নাত-জাহান্নাম, ইসলামের বিভিন্ন সৌন্দর্য ও নবী-রাসূলগণ এবং ছাহাবীগণের আত্মজীবনী ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা রাখতে পারেন। পাশাপাশি হিকমাতের সাথে কুরআন-হাদীছ থেকে বিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা তাদের সামনে তোলে ধরুন। তবে অল্পতে ভেঙ্গে পড়বেন না। সাহসিকতার সাথে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক তার উপর অবিচল থাকুন। ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করুন। এতে করে খুব সহজেই মুছল্লীদের মধ্যে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হবে এবং তারা আল্লাহমুখী হবে ইনশাআল্লাহ।

Contents

প্রশ্ন (৯/৮৯) : 'আচার-আচরণ ও চাল-চলনে ব্যক্তিদের মাঝে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনেক বেশী নিকটবর্তী হলেন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)' হাদীছটি সঠিক কি-না? সঠিক হলে হাদীছটি বিস্তারিত জানতে চাই।

-নাজমুস সাকীব আব্দুল্লাহ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ

উত্তর : উক্ত হাদীছ সঠিক। হাদীছটি হ'ল- আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হুযায়ফা (রাঃ)-এর কাছে এসে বললাম, আপনি আমাদেরকে এরূপ একজন ব্যক্তির সন্ধান দিন, যিনি আচার-আচরণে অপরদের চাইতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বেশী কাছের, যাতে আমরা তার নিকট দ্বীন শিখতে পারি। তখন হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আচার-আচরণ ও চাল-চলনে ব্যক্তিদের মাঝে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনেক বেশী নিকটবর্তী হলেন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)। তিনি আমাদের মাঝ হ'তে অন্তরাল হয়ে আমাদের মাঝে অবস্থান করতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশ্বস্ত ছাহাবীগণ ভালভাবে অবগত আছেন যে, ইবনু উম্মু আবদ (আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ) তাদের প্রত্যেকের তুলনায় আল্লাহ তা'আলার বেশী নৈকট্য লাভকারী *(তিরমিযী হা/৩৮০৭, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১০/৯০) : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর তৃতীয় দফা কর্মসূচী 'তারবিয়াত' বা প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের নিয়াম-কানূন জানতে চাই।

-সুফিয়া আখতার, নারায়রণগঞ্জ

উত্তর : এক বা একাধিক শাখার কর্মীগণ মিলিতভাবে কমপক্ষে প্রতি তিন মাস অন্তর একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করবেন। এতে প্রশিক্ষক হিসাবে প্রয়োজনবোধে ঊর্ধ্বতন সংগঠন থেকে কোন প্রতিনিধিকে দাওয়াত দেওয়া যেতে পারে। তবে সেজন্য অন্ততঃ একমাস আগে যোগাযোগ করতে হবে। সফরের ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট শাখাগুলোকে বহন করতে হবে।

প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের নিয়মাবলী : (ক) প্রথম দিন বাদ আছর হ'তে পরদিন এশা পর্যন্ত অথবা সকলের সুবিধানুযায়ী অন্যূন ত্রিশ ঘণ্টা মেয়াদী এই প্রশিক্ষণ চলবে। (খ) প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে পরিচালকের অনুমতি ব্যতীত কেউ বাইরে যাবেন না। (গ) খাওয়া-দাওয়া, নাশতা-ঘুম সবই একত্রে এবং সময়সূচী মোতাবেক হবে। কেননা এটাও প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। (ঘ) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক কর্মী অবশ্যই খাতা-কলম সঙ্গে রাখবেন এবং প্রয়োজনীয় নোট করে নিবেন। (ঙ) প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের স্থান নির্বাচন ও অন্যান্য কর্মসূচী মাসিক দায়িত্বশীল বৈঠকে গৃহীত হবে এবং অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বে তা সংশ্লিষ্ট সকল শাখার কর্মীদের জানিয়ে দিবেন। (চ) শাখা/এলাকা/উপযেলা/যেলা ও কেন্দ্রীয় সভাপতি স্ব স্ব পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের সভাপতি থাকবেন। তবে বিশেষ বিবেচনায় কোন যোগ্য 'উপদেষ্টা'কে উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি করা যাবে।

প্রশ্ন (১১/৯১) : সাংগঠনিক মযবুতিকরণে 'ইহতিসাব' বা ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণের উপায় কি?

-মেহেদী হাসান, নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী ক্যাম্পাস

উত্তর : এটি কর্মী তৈরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। যে কর্মীর রিপোর্ট যত উন্নত হবে, তিনি তত উন্নত কর্মী হতে পারবেন। নিয়মিত 'ইহতিসাব' বা ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে একজন কর্মী তার ঈমান-আমলের হ্রাস-বৃদ্ধি পরখ করতে পারে এবং ক্রমে নিজেকে সংশোধন করে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত হয়।

প্রতি মাসিক কর্মপরিষদ বৈঠকে কর্মীগণ সংশ্লিষ্ট সভাপতিকে নিজ নিজ রিপোর্ট দেখাবেন। যারা লিখতে জানেন না, তারা মৌখিকভাবে এটা পেশ করবেন এবং সভাপতি তা নোট করে নিবেন। সভাপতি নিজ কর্মপরিষদের নিকট তাঁর রিপোর্ট পেশ করবেন। সভাপতি কর্মীদের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে প্রত্যেকের রিপোর্ট বইতে আলাদা আলাদা মন্তব্য লিখবেন। অতঃপর সকলের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক বক্তব্য রাখবেন। *(কর্মপদ্ধতি, পৃঃ ৩০)*।

প্রশ্ন (১২/৯২) : 'ভাল চরিত্রই হচ্ছ ভাল কর্মের মধ্যে সর্বোত্তম' হাদীছটি কি সঠিক?

-আলী হাসান, খুলনা

উত্তর : হাদীছটি জাল, মিথ্যা ও বানোয়াট। উক্ত হাদীছের সনদে আল-গাল্লাবী নামে একজন হাদীছ জালকারী রয়েছে *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৭৬৮; যঈফুল জামে' হা/১৩৭৩)*।

প্রশ্ন (১৩/৯৩) : আমি আমার পরিবারের অভিভাবক। সে হিসাবে সঠিক ভাবে পরিবার পরিচালনা করাই আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে পরিবারের অন্য সদস্যরা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। ফলে তারা বিভিন্ন বিজাতীয় মতবাদ ও সংস্কৃতিতে আসক্ত। ইসলামী রীতিনীতির প্রতি তারা বেজায় অসন্তুষ্ট। উক্ত পরিস্থিতিতে অভিভাবকের দায়িত্ব পালনে খুব সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। একদিকে সন্তান-সন্ততির ইসলাম বিরোধী অসংখ্য আবদার, অন্যদিকে তাদের পক্ষ থেকে মায়ের সমর্থন। অথচ যেগুলোর ব্যাপারে আমার একদম সমর্থন নেই। এসব নিয়ে সর্বদা বড় চাপের উপর থাকি। কিছুই ভাল লাগে না। তাদেরকে অনেক বুঝানের চেষ্টা করছি কিন্তু তারা বুঝতে চায় না। তাই নিজেকে খুবই অপরাধী মনে হয়। উপরিউক্ত কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুক্তির এবং আমার পরিবারের সদস্যদের ভাল পথে ফিরিয়ে আনার কি কোন উপায় আছে? থাকলে দয়াকরে পরামর্শ দিন, যাতে করে আমি সুস্থ জীবন-যাপন করতে পারি।

-ইমরান, উজিরপুর, বরিশাল

উত্তর : এখানে নিজেকে অপরাধী মনে হওয়ার কিছুই নেই। কেননা হেদায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। এক্ষেত্রে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে পরিবারকে বুঝাতে হবে। কৌশলে তাদেরকে বিভিন্ন ইসলামিক বই পড়তে দিন। যেমন- বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, রিয়াযুছ ছালেহীন প্রভৃতি। সর্বদা হাসি-খুশি ও সবার সাথে সদ্ব্যবহার বজায় রাখুন। সুন্দর আচরণ দিয়ে তাদেরকে সঠিক দ্বীন বুঝানোর চেষ্টা করুন। তাদের

সংশোধনের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। বিজাতীয় মতবাদের কুফল তাদের সামনে তোলে ধরুন। ইসলামী রীতিনীতি ও সংস্কৃতির সৌন্দর্য তাদের সামনে ফুটিয়ে তুলুন। তাদের সম্মুখে নিজেকে একজন মডেল হিসাবে উপস্থাপন করুন। পরিবারের অভিভাবক হিসাবে প্রয়োজনে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করুন। দেখবেন এক সময় তারা ইসলামী রীতিনীতি ও সংস্কৃতিকে ভালবাসতে শুরু করেছে। আর আপনিও শান্তি ও তৃপ্তি খুঁজে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (১৪/৯৪) : 'আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ছালাতের সুতরাকে কেন্দ্র করে খলীফা মারওয়ানের ছেলেকে প্রহার করেছিলেন' মর্মে বর্ণিত ঘটনা সত্য কি? সত্য হলে ঘটনাটি জানতে চাই।

-আসাদুযযামান জুয়েল, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

উত্তর : আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন, একদা তিনি ছালাত আদায় করছিলেন, এমন সময় খলীফা মারওয়ানের এক ছেলে তার সামনে দিয়ে যেতে থাকে। তিনি তাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সে ফিরে না গিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। তখন আবু সাঈদ (রাঃ) তাকে মার লাগান। ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে সোজা মারওয়ানের কাছে গিয়ে অভিযোগ করল। মারওয়ান তখন আবু সাঈদকে বললেন, আপনার ভাতিজাকে মারলেন কেন? তিনি বললেন, আমি তো তকে মারিনি, আমি মেরেছি শয়তানকে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কেউ ছালাত রত থাকে এবং এমন সময় কোন মানুষ তার সামনে দিয়ে যায়, তখন সে যেন তাকে যথাসাধ্য সরিয়ে দেয়। কিন্তু যদি সে না মানে তাহ'লে যেন তার সঙ্গে লড়াই করে। কেননা সে শয়তান *(নাসাঈ হা/৪৮৬২, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৫/৯৫) : 'আম্মার ইবনু ইয়াসার (রাঃ) শয়তানের সাথে লড়াই করেছিলেন' মর্মে ঘটনাটি জানতে চায়।

-কামারুযযামান, তানোর, রাজশাহী

উত্তর : আম্মার (রাঃ) একদা বলেন, আমি শয়তানের সাথে লড়াই করেছি। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কিভাবে? আম্মার (রাঃ) বললেন, কোন এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সফরসঙ্গী হ'লাম। পথিমধ্যে রাত্রি ঘনিয়ে আসলে আমরা এক পাহাড়ের পাদদেশে রাত্রি যাপনের জন্য যাত্রা বিরতি করলাম। আমি বালতি ও মশক নিয়ে পানি অন্বেষণের জন্য রওয়ানা হ'লাম। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সাবধান থেকো, পানির ভেতর থেকে কেউ এসে তোমাকে পানি আনতে বাধা দিতে পারে। আম্মার (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি জলাশয়ের মোহনায় পৌঁছলাম। ইতিমধ্যে পানির ভেতর থেকে কাকের চেয়েও কুৎসিত এক লোক বের হয়ে এসে বলল, আল্লাহ্র কসম! তোমাকে আমি কিছুতেই পানি নিতে দেব না। আমি তার কথায় কর্ণপাত না করে সম্মুখে অগ্রসর হ'লাম। তখন সে এগিয়ে এসে আমাকে আক্রমণ করল। আমিও প্রচণ্ড বেগে তাকে একটা থাপ্পর বসিয়ে দিলাম। তখন সে আমাকেও প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করল। তখন আমি পাথর দিয়ে সজোরে তার মুখে ও কানে আঘাত করলাম। এতে সে পিছে হটে গেল। আমি বালতি ও মশক পূর্ণ করে ফিরে এলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, هل اتاك علي الماء احد 'পানির ভেতর থেকে কেউ তোমার নিকট এসেছিল কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি জান, সে কে? আমি বললাম, না। তখন তিনি বললেন, সে হ'ল শয়তান *(ফাৎহুল বারী ৭/৯২ পৃঃ; তুহফাতুল আহওয়াযী ১০/২১৩ পৃঃ; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/৪১২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৬/৯৬) : মসজিদুল আক্বছা সর্বপ্রথম কবে নির্মাণ হয়?

-আব্দুল মুমিন, টাঙ্গাইল

উত্তর : মসজিদুল আক্বছা সর্বপ্রথম নির্মিত হয় মসজিদুল হারাম নির্মাণের ৪০ বছর পর। যেমন- আবু যার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, পৃথিবীতে কোন্ মসজিদ সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছে? তিনি বললেন, মসজিদুল হারাম (কা'বা গৃহ)। আমি বললাম, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন, মসজিদুল আক্বছা। আমি বললাম, দু'টির নির্মাণকালের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত? তিনি বললেন, ৪০ বছর। অতঃপর যেখানে তোমাদের ছালাতের স্থান হয়ে যায়, সেখানেই ছালাত আদায় কর। কেননা তার মধ্যেই অনুগ্রহ রয়েছে *(বুখারী হা/৩৩৬৬ 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৭/৯৭) : কোন্ কোন্ ছাহাবী মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বায়তুল্লায় প্রবেশ করেছিলেন?

-আবু সাঈদ, রংপুর

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেদিন বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করে বায়তুল্লাহ্র অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন, তখন তাঁর সাথে যারা ছিলেন তাদের নাম বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ওমর (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বায়তুল্লাহ্র অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন উসামা বিন যায়েদ (রাঃ), বিলাল (রাঃ) ও ওছমান বিন ত্বালহা (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন *(ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবা ৩/১৩৯ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৮/৯৮) : ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর ইন্তেকালের বিখ্যাত ঘটনাটি জানতে চায়।

-জাহিদুল ইসলাম, মুচড়া, আখড়াখোলা, সাতক্ষীরা

উত্তর : ইমাম মুসলিম (রহঃ) একদিন হাদীছ পুনরালোচনা বৈঠকে আহূত হলেন। তাঁকে একটি হাদীছ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সেটা চিনতে পারলেন না। বাড়ী ফিরে এসে তিনি আলো জ্বালালেন এবং বাড়ীর লোকদের বললেন, কেউ যেন এ ঘরে প্রবেশ না করে। তখন তাঁকে বলা হ'ল যে, এক ঝুড়ি খেজুর আমাদেরকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। তাঁর নিকট খেজুর ঝুড়ি রাখা হ'ল। তিনি হাদীছ অধ্যয়ন করতে শুরু করলেন এবং একটা একটা করে খেজুর খেতে থাকলেন। এভাবে ভোর হয়ে গেল। তিনি খেজুর খেয়ে শেষ করলেন এবং হাদীছটিও পেলেন। এই অধিক আহার গ্রহণের ফলে বদহজমের কারণে তিনি ইন্তেকাল করলেন *(তাহযীবুল কামাল ১৮/৭৩ পৃঃ)*।

পবিত্র কুরআন শ্রবণ করে মুসলিম হলেন বিমানের পাইলট

[একজন নওমুসলিম, যার জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে কিনে নিয়েছেন মহান প্রভুর নির্দেশিত পথ। আত্মসমার্পণ করেছেন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র নিকটে। ইসলামের খেদমতে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। এবার আসুন সেই মহান ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের কাহিনী শুনা যাক]

মহান আল্লাহ্‌র দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা ‘এই সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই’ *(বাক্বারাহ ২/২)*। এই একটি আয়াত বদলে দিয়েছিল যার জীবন, তার নাম আন্দ্রেই স্ট্যালিন। তিনি ছিলেন অস্ট্রিয়ার জাতীয় পতাকাবাহী বিমান সংস্থা ‘অস্ট্রিয়ান এয়ারে’র একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান পাইলট। দেখা যেত প্রচুর তুষারপাত হচ্ছে। যেখানে কেউ বিমান চালাতে সাহস পাচ্ছে না, সেখানে আন্দ্রেই স্বাভাবিক ভাবেই বিমান নিয়ে উঠানামা করছেন। এরকম একজন অভিজ্ঞ বিমান চালকের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী সত্যি খুব চমৎকৃত করবে মুসলিমদের।

তার বয়স যখন ৩০ বছর, তখন তার ফ্লাইট দেয়া হ’ল চার্টার্ড রুটে, সেটি ছিল ভিয়েনা থেকে জেদ্দা রুটের একটা বিশেষ ফ্লাইট। তাতে কিছু যাত্রী ছিলেন, যারা জেদ্দায় একটি সেমিনারে অংশ গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন। বিমান মাঝ আকাশে আসলে তিনি কো পাইলটের হাতে অপারেটিং ছেড়ে বিমানের পিছনের দিকে যাচ্ছিলেন যাত্রীদের মাঝ দিয়ে। এমন সময় একটা কথা তার কানে প্রবেশ করল, ‘এই সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই’। তিনি এই কথাটি শুনে সেই যাত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা আবার এমন কি বই, যাতে কোন ভুলভ্রান্তি নেই? তার প্রশ্নের জবাবে যাত্রীটি বলল, এটা আমাদের মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন, যা সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে। এটি আল্লাহ প্রদত্ত বলেই এতে কোন ভুল নেই। এতে মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান লেখা আছে। যাত্রীর কথা শুনে তিনি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে তার কাজে চলে গেলেন।

সুধী পাঠক! এর ঠিক ১ মাস পর তাঁকে আবার ইস্তাম্বুল আসতে হয় একটা কাজে। তখন তিনি তুরস্কের নীল মসজিদ দেখতে আসেন। এমতাবস্থায় সেখানে মাগরিবের ছালাত চলছিল। তিনি এটা দেখে অবাক হয়ে যান যে, একজন কালো মানুষের পাশে আরেকজন সাদা চামড়ার মানুষ দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করছে। কয়েক হাযার মানুষ একত্রে প্রার্থনা করলেও সেখানে ছিল না কোন কোলাহল, কোন শব্দ; সবাই একজন নেতার অনুসরণ করছে। বাহ, কি সুন্দর আকর্ষণীয় দৃশ! হৃদয়ে উথাল-পাতাল শুরু হ’ল।

তখন তিনি আবার সেই শব্দটি শুনতে পান, ‘এই সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই’। তিনি মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে মনোমুগ্ধের ন্যায় ছালাত দেখতে লাগলেন। যখন ছালাত শেষ হ’ল, তিনি সেখান থেকে চলে আসলেন। কিন্তু তার মনে ছিল অস্থিরতা। তিনি কেবল ভাবছিলেন, আমি যদি ঐ মানুষদের সাথে দাঁড়াতে পারতাম, তাহ’লে হয়তো আমার মনে শান্তি পেতাম।

রাতে হোটেলে এসে তিনি গোসল করলেন এবং সন্ধ্যায় দেখা মসজিদে ছালাতের অনুকরণ করতে লাগলেন। তার মনে হ’ল এর চেয়ে ভাল কোন ব্যায়াম হ’তে পারে না। তখনি সেই যাত্রীটির কথা তার মনে পড়ল। সে বলছিল, ‘এতে মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান লেখা আছে’। তখন তার মনে হ’ল ইসলাম সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া উচিত। তিনি পরদিন সকালে আবার সেই নীল মসজিদে গেলেন এবং সেখানের এক লোককে জিজ্ঞেস করে একজন ইমামের সাথে দেখা করলেন এবং তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করলেন। ইমাম ছাহেব তাঁকে সাবলীলভাবে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। ইমাম ছাহেবের সাথে কথা বলতে গিয়ে তার মনে হ’ল, তিনি কোন সাধারণ মানুষের কথা শুনছেন না কোন এক সবজান্তার কথা শুনছেন। তিনি ইমাম ছাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কিভাবে এত সুন্দর করে বলতে পারেন? ইমাম ছাহেব জবাব দিলেন, আমি নিজের থেকে একটা কথাও বলিনি সব কথাই আমি এই কুরআন থেকে বলেছি।

তখন তিনি অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, ‘আমাকে কি আপনি এই মহান বইটার খোঁজ দিতে পারেন? আমি একটা বই কিনে নেব’। ইমাম ছাহেব হাসিমুখে তার সেলফ থেকে জার্মান ভাষায় একটি অনুদিত কুরআন তাঁকে উপহার দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন এটা পড়ার সময় কি কোন বিশেষ নিয়ম মানতে হয়? ইমাম ছাহেব তাঁকে বললেন, আপনি যদি পবিত্র হয়ে অর্থাৎ গোসল করে এই বইটি পড়েন তবে ভাল হয়। ইমাম ছাহেবের কথা শুনে তিনি কুরআন মাজীদ নিয়ে দেশে ফিরে এলেন এবং ১৫ দিনের ছুটি নিলেন।

অতঃপর বাসায় ফিরে আসলেন। তারপর গোসল করে কুরআন নিয়ে টেবিলে বসলেন এবং পড়া শুরু করলেন। তিনি আরবী পড়তে জানতেন না কিন্তু শুনলে অর্থ বুঝতে পারতেন। তাই আরবী বাদ দিয়ে জার্মান ভাষায় অনুবাদ পড়তে শুরু করলেন। পড়ার পর তার মনে হ’ল এটা কোন মানুষের রচনা হতেই পারে না। তিনি মাত্র ১০ দিনে কুরআন শেষ করে ফেললেন। আবার পড়তে শুরু করলেন। যখন তিনি সূরা বাক্বারাহ্‌র ১৬৩ নং আয়াত পড়লেন, তখন তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, ‘আমি এই মহাগ্রন্থের রচয়িতা মহা শক্তিমান আল্লাহকে প্রভু বলে স্বীকার করছি এবং এই আয়াতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করছি’। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।

তার মনে হ’ল, তিনি যেন এক মহান শান্তির পরশ অনুভব করছেন। তার কাছে তুরস্কের সেই ইমাম ছাহেবের টেলিফোন নম্বর ছিল। তিনি তাঁকে ফোন করলেন এবং বললেন, আমি মুসলিম হ’তে চাই, আমি জান্নাত পেতে চাই, আমাকে কি করতে হবে বলুন, বলুন বলে তিনি অস্থির হয়ে বলে উঠলেন।

ইমাম ছাহেব বললেন, আপনি কালেমা ত্বাইয়েবা এবং কালেমা শাহাদাত পড়ুন এবং এর সাথে একাত্মতা পোষণ করুন, তাহ’লেই আপনি মুসলিম হ’তে পারবেন। তিনি তুরস্ক থেকে আসার সময় ইমাম ছাহেব তাঁকে আরো কিছু বই দিয়েছিলেন, সেখানে তিনি কালেমা সমূহ পেলেন এবং সেই রাতে গোসল করে কালেমা পড়লেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে বললেন, ‘হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আপনার প্রদত্ত ধর্মকে আমার জন্য গ্রহণ করেছি’।

এরপর শুধুই ইতিহাস...। সেই আন্দ্রেই স্ট্যালিন আবার চলে গেলেন তুরস্কে এবং সেখানেই স্থায়ী বসবাস শুরু করলেন। ২০০৯ সালে তিনি ৩য় বারের মত মক্কা আসেন ওমরা হজ্জের নিয়ত নিয়ে এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তাঁকে মক্কাতেই দাফন করা হয়।

আন্দ্রেই স্ট্যালিন ইসলাম গ্রহণ করার পরে তাঁর নাম গ্রহণ করেন আবুবকর। তিনি বিয়ে করেননি। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ১৯৯৬ সালে এবং তার ইন্তেকাল ২০০৯ সালের ৩রা আগস্ট

স্বরণদীবের স্মরণকথা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(তিন)

ফজর পড়ে সোহেল ভাই এবং আসলাম ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বের হ'তে দেরী হয়ে গেল। লাগেজ সব রাখা হ'ল আসলাম ভাইয়ের বাসাতেই। সকাল ৮টার দিকে কলম্বো ফোর্ট পৌঁছে তাৎক্ষণিক ক্যান্ডিগামী একটি লোকাল বাস পেয়ে চড়ে বসলাম। পরিকল্পনা ছিল প্রথমে পিনাওয়ালায় হাতির অনাথাশ্রম দেখা। ক্যান্ডি শহর থেকে ৩০ কি.মি. পূর্বে কিগাল্লে নেমে আরো প্রায় ২০ কি.মি. ভেতরে মূল স্পটটি। ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই অভিভাবকহারা হাতির আশ্রমটি বিশ্বব্যপী খ্যাতি পেয়েছে। প্রায় ৭০/৮০টি হাতি এখানে বাস করে পাহাড়-নদী ঘেরা মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে। সামনের সিটে বসেছিলাম। গাড়ি অল্প কিছুদূর যাওয়ার পর বোরকা পরিহিতা একজন মহিলা তাঁর মা ও মেয়েকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। গাড়িতে সীট নেই। আমাকে কিছু একটা বললেন স্থানীয় ভাষায়। সম্ভবত বয়স্কা মাকে সীট দিতে বলছিলেন। আমি বুঝলাম না। আমার পিছনের সীটে একজন উঠে জায়গা করে দিলে বিষয়টা টের পেলাম। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সেই মহিলাকেও জায়গা করে দিলাম। ভদ্রমহিলা ইতোমধ্যে বুঝে নিয়েছেন আমি ভিনদেশী। এবার পরিষ্কার ইংরেজীতে কথা বলা শুরু করলেন। আমার পরিচয় জেনে তারপর নিজের পরিচয় দিলেন। কলম্বোর এক স্কুলে শিক্ষকতা করেন ফারিহা নাম্মী এই বোন। জানালেন, গত বছর বৌদ্ধ এবং মুসলিমদের মধ্যে হঠাৎ দাঙ্গা লেগেছিল। স্বল্পপরিসরে হ'লেও সেই দাঙ্গা যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল মুসলিম সমাজে। পরিস্থিতি এতদূর গড়ায় যে, মুসলিম পুরুষ-মহিলারা টুপি, বোরকা পরতেও সন্ত্রস্তবোধ করছিলেন। তবে এখন আর কোন সমস্যা নেই। পরিস্থিতি স্বাভাবিক এবং মুসলিমরা আত্মপরিচয় নিয়ে আগের চেয়ে আরও বেশী দৃঢ়প্রত্যয়ী। কলম্বো শহরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী-বেসরকারী স্থাপনাগুলো তিনি চিনিয়ে দিলেন। ক্যান্ডি সম্পর্কেও প্রাথমিক কিছু আইডিয়া দিলেন। তারই পরামর্শে পিনাওয়ালা না নেমে সরাসরি ক্যাণ্ডি যেতে মনস্থ করলাম। ক্যাণ্ডি থেকে সরাসরি গাড়ি পাওয়া যাবে শুনে। পরে অবশ্য ক্যান্ডি শহরে ঢুকতে অপ্রশস্ত সড়কে দেড় ঘণ্টার দীর্ঘ জ্যামে আটকে বুঝতে পারলাম মস্ত ভুল হয়ে গেছে। এখন আর ফেরত যাওয়ার উপায় নেই। সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় শ্রীলংকা এখনও বেশ পিছিয়ে আছে দেখছি!

ক্যান্ডি নামতে প্রায় যোহরের সময় হয়ে গেল। সোহেল ভাই তার এক শ্রীলংকান বন্ধু লুক্বমান ছাহেবের নম্বর দিয়েছিলেন। তিনি ফোনে জানালেন যরূরী কাজে তাকে এখনই কলম্বো যেতে হচ্ছে। সুতরাং যা করার নিজেকেই করতে হবে। এদিক-সেদিক তাকাচ্ছি। একজন টুপিওয়ালা পথচারীর দিকে চোখ পড়তে জোর পায়ে এগিয়ে গেলাম। তিনি ইশারায় দেখিয়ে দিলেন অল্প দূরে মসজিদুত তাক্বওয়া। মসজিদে ঢুকে ইমাম মাহের ছাহেবের দেখা পেলাম। পরিচয়ের পর জানতে চাইলাম এখানকার মুসলিমদের অবস্থা। তিনি জানালেন, ক্যান্ডি তথা শ্রীলংকার মধ্যাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চলে মুসলিমদের সংখ্যা সর্বাধিক। প্রায় ৩ লক্ষাধিক মুসলিম বসবাস করেন ক্যান্ডিতে। যাদের বড় একটা অংশ মালয়ী বংশদ্ভূত। এই মসজিদটিও মালয়ী মসজিদ হিসাবে পরিচিত। নির্মিত হয়েছে ১৯৬৪ সালে। যোহরের ছালাত আদায়ের পর সেখান থেকে বের হয়ে মিউনিসিপ্যালিটি ভবনের কাছে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে এলাম এক ভাইয়ের সাথে। এটি তাবলীগ জামাআতের একটি বড় মারকায। পরে সেখানে দুপুরের খাবার খেয়ে সিটি সেন্টারে আসলাম। তারপর একটু ঘোরাঘুরি করে 'ব্যাংক অফ সীলনে'র সম্মুখে একটি পার্কে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম।

চমৎকার সবুজে সবুজে ভরপুর পাহাড়ী শহর ক্যাণ্ডি। শহরের মধ্যে স্থির পানির এক বিশাল লেক। পাহাড়ের উপর থেকে চমৎকার দেখায় সে দৃশ্য। ইউরোপীয় পর্যটকে বলা যায় গিজগিজ করছে শহর। ট্রাডিশনাল কোন মেলা-টেলা ছিল বোধহয়। সেজন্য ভীড় চারিদিকে। ভীড় ছাড়িয়ে উন্মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য ফুসফুস অস্থির হয়ে উঠেছে। পার্শ্বেই 'টেম্বল অফ টুথ' তথা গৌতম বুদ্ধের তথাকথিত দাঁতের সংরক্ষণস্থল ধবধবে সাদা এক মন্দির। ভিতরে ঢুকতে মন চাইল না। আসার পর থেকে যত্র তত্র অগণিত মূর্তি দেখে বড় ক্লান্তি লাগছে। ধর্ম পালিত হচ্ছে মহা সমারোহে কিন্তু ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য বলে যে কিছু আছে, তা কোথাও টের পাওয়ার জো নেই। বরং এদের কীর্তিকলাপ যে ধর্মকে কতটা হাস্যকর বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছে, সেটাই ভাবছিলাম। একটি মন্দিরের প্রবেশপথে দেখলাম বিশালদেহী এক সিংহমূর্তি। সেই মূর্তির হা করা মুখ দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয় আর পশ্চাদদেশ দিয়ে বের হ'তে হয়। নিছক হাসি-তামাশার ব্যাপার। বড়জোর সেটা শিশুপার্ক হতে পারে, কিন্তু উপাসনালয় হয় কেমন করে? মন্দিরের গায়ে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত বিশ্রী সব মূর্তি। দেখলে গা গুলিয়ে উঠে। অথচ মানুষ সসম্ভ্রমে তাতে প্রবেশ করছে। কোন মন্দিরের সামনে রাস্তার উপর টাকা রাখার বাক্স। মানুষ বাক্সে টাকা ফেলছে আর রাস্তা থেকেই দু'হাতে মাথা ঠুকছে ভিতরের মূর্তির উদ্দেশ্যে। শতভাগ শিক্ষিত মানুষের এই দেশ আবার সর্বাধিক ধর্মপরায়ণ মানুষের দেশ হিসাবেও খ্যাতি লাভ করেছে। এক রিপোর্টে এসেছে, শ্রীলংকার শতভাগ জনগণই ধর্মকে তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করে। আর এই হ'ল তাদের ধার্মিকতার নমুনা! শিক্ষিত মাত্রই সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন নয়, বুদ্ধিমান মাত্রই বিবেকবান নয়–এটাই কেবল মনে হ'তে থাকে। বার বার আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করি নিজেকে মুসলিম হিসাবে ভাবতে পেরে। আর আফসোসে দমটা বন্ধ

হয়ে আসে এই সব অর্থহীন, অযৌক্তিক ধর্মের কার্যকলাপ দেখে আর এদের চূড়ান্ত পরিণতির কথা ভেবে। বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস কেটে বেরিয়ে আসে একটিই বাক্য– হে আল্লাহ, এদের আপনি হেদায়াত দান করুন।

মনের আকাশ থেকে তখনও ফিঁকে হয়নি 'এডামস্ পিকে'র স্বপ্ন। এই পাহাড়টার নাম ঠিক কী কারণে শৈশব থেকে মনের গহীনে গেঁথে আছে কে জানে! আজ এত কাছে এসে ফিরে যাব!–এই হতাশাই বোধহয় বেমালুম ভুলিয়ে দিল এখান থেকে আর মাত্র ৪০/৪৫ কি. মি. দূরে কুরুনাগ্যালে। গতদিন আব্বার থিসিস থেকে ডায়েরীতে টুকে রেখেছিলাম শায়খ আবুবকর ছিদ্দীক মাদানীর মাদরাসার ঠিকানা। অথচ চোখের সামনে দিয়ে কুরুনাগ্যালের গাড়ি চলে গেল, তবুও কোন ভাবান্তর হয়নি। শ্রীলংকার সর্বপ্রথম এবং বৃহত্তম আহলেহাদীছ মাদরাসা 'মা'হাদ দারুত তাওহীদ আস-সালাফিয়া' দর্শনের পরিকল্পনা এভাবেই মাঠে মারা গেল।

'এডামস পীক' ঐ পর্বতচূড়া, যেখানে আদম (আঃ) জান্নাত থেকে পৃথিবীর বুকে অবতরণ করেন এবং তাঁর একটি পদচিহ্ন রয়েছে বলে মুসলিম আরব বণিকদের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল। যদিও এর কোনই ভিত্তি নেই। পাহাড়ের শীর্ষে সংরক্ষিত এই পদচিহ্নটি একটি পাথরের উপর গভীরভাবে অংকিত রয়েছে, যার আয়তন ৫.৭ ফুট বাই ২.৬ ফুট। বৌদ্ধদের মতে এটি গৌতম বুদ্ধের পদচিহ্ন। তারা একে 'শ্রী পদ' আখ্যা দেয়। খৃষ্টানরা বিশ্বাস করে, আদম (আঃ) জান্নাত থেকে অবতরণের পর স্বীয় পাপ মোচনের জন্য এখানে এক হাযার বছর এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর হিন্দুরা মনে করে, এটি দেবতা শীবের পদচিহ্ন। যাইহোক, অনাদিকাল থেকেই মানুষ এই পদচিহ্নকে তীর্থস্থান বানিয়ে নিয়েছে আপন আপন বিশ্বাসকে সামনে রেখে। ভূপর্যটক ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৭৭ খৃঃ) তাঁর সফরনামায় এই পর্বত আরোহণের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, মালদ্বীপ থেকে সমুদ্রপথে সীলন দ্বীপে পৌঁছানোর ৯ দিন পূর্বে আমরা সরণদীব পাহাড়ের চূড়া দেখতে পেলাম আকাশে মাথা তুলে থাকা ধোঁয়ার স্তম্ভের মত। তাঁর পূর্বেও অনেক দরবেশ এই 'কাদামু আদাম' সফর করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। পর্তুগীজরা এই পর্বতচূড়াকে 'এডামস্ পীক' আখ্যা দেয়।

শ্রীলংকায় ২য় উচ্চতম এই পাহাড়ের উচ্চতা ৭৩৪১ ফুট (২২২৪ মিটার)। পাহাড়ে আরোহণের প্রধানতঃ ২টি রুট। একটি রত্নপুরা থেকে শুরু হয়, ইবনে বতুতার তথ্যমতে যাকে বলা হত মামা (হাওয়া) পথ এবং অপরটি হাটন থেকে, যার নাম ছিল বাবা (আদম) পথ। মামা পথটি রাজধানী কলম্বো থেকে নিকটবর্তী। অপর পথটি ক্যান্ডি হয়ে হাটন শহর থেকে যেতে হয়। এ পথে আরোহণ তুলনামূলক কঠিন। চার ঘণ্টার পথ। ভাঙতে হয় প্রায় ৫ হাযার সিঁড়ি। ডিসেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত পীক সিজন। এর বাইরে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে মানুষ সাধারণত যাতায়াত করে না। ফলে জঙ্গলাকীর্ণ যাত্রাপথে জন্তু-জানোয়ারের সম্মুখীন হ'তে হয়।

পরদিন সকালে গলে যাব। তাই পার্ক থেকে বের হয়ে রেলস্টেশনে ঢুকলাম। কলম্বোগামী নাইট ট্রেনে টিকিট কেটে রাখলাম। তারপর বাসস্টেশনে এসে হাটনগামী এক লোকাল বাসে চড়ে বসলাম। এমনিতেই উদ্দেশ্যহীনভাবে। 'এডামস পীক' আরোহণের চিন্তা তখনও উঁকি দিচ্ছিল হয়ত। নিরুদ্দেশ ভবঘুরে যাত্রায় অব্যক্ত এক আনন্দ আছে। শরতের আকাশে স্থির ডানা মেলে উড়ে বেড়ানো উদাসী শঙ্খচিলের মত ভাবালুতায় পেয়ে বসে। আগ-পিছ টান নেই, সময়ের তাড়া নেই। কেবলই আপনমনে উপভোগ করে যাওয়া। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে গাড়ি ছুটতে থাকে। চারিধারে সবুজ চাঁদোয়ার মত বিছানো চা বাগানের সারি। সাজানো-গোছানো অদ্ভুত সুন্দর। এক সময় আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামে। বৃষ্টির পর রাজ্যের মেঘ নেমে আসে পাহাড়ের ঢালে। চা বাগান ছুঁয়ে ছুঁয়ে অপরূপ রহস্যজাল বিস্তার করে যায়। হিম হিম বাতাস আর মাটির সোদা গন্ধে বুঁদ হয়ে উঠে বৃষ্টিভেজা প্রকৃতি। এমন মনোহর বিকেল জীবনে খুব বেশী আসেনি। হাটন পৌঁছার খানিক আগে সড়কের ডানদিক দিয়ে চিকন রাস্তা চলে গেছে। সেখানে এ্যারোচিহ্ন দেয়া রোডসাইন–'এডামস্ পীক'। বৌদ্ধদের দেশ, অথচ 'শ্রীপদ' না লিখে 'এডামস্ পীক' লেখার হেতু বুঝি না। বিদেশী পর্যটকদের সন্তুষ্ট করার জন্যই কি? দু'ঘণ্টা বাদে হাটন শহরে এসে পৌঁছি। বৃষ্টি থেমেছে। তবে আকাশ মেঘমেদুর। এক দোকানে ঢুকে চিপসের প্যাকেটে হাত দেই। দোকানদার সাগ্রহে বলে ওঠে হালাল, হালাল। মৃদু হেসে বলি, চিপসে আবার হালাল-হারাম কেন? উত্তর পাই না। তবু আনন্দিত হই মুসলিম সংস্কৃতির প্রতি তাদের শ্রদ্ধা দেখে। এক টুকটুকওয়ালা এগিয়ে এল। জানালো ১৮০০ রুপিয়াহ ভাড়ায় সে ডালহৌসি তথা 'এডামস পীক'-এর পাদদেশে রেখে আসবে। ৩৮ কিলোমিটার পথ। রাত ১২টায় রওনা দিতে হবে। আমি আকাশপানে চেয়ে হতাশাবোধ করি। এই বৃষ্টিমুখর রাতে জঙ্গলের পথে নিঃসঙ্গ সফর! নাহ, শেষ সম্ভাবনাটাও বিলীন হয়ে গেল। ফিরতিবাসে আবার ক্যান্ডি চলে আসলাম। এক ইণ্ডিয়ান হোটেলে রাতের খাবার সেরে তাক্বওয়া মসজিদে ঢুকলাম। মসজিদের ইমাম ও খাদেম জেগে ছিলেন। তাদের সাথে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে রেলস্টেশনে আসলাম। শহরের প্রাণকেন্দ্র এতক্ষণ ছিল সুনসান নীরব। হঠাৎ মানুষে মানুষে ভরে গেল। রাস্তায় যানজট লেগে গেল। লোকজন সব ছিল এক মেলায়। মেলা ভাঙার পর সবাই যার যার গন্তব্যে ফিরে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছে। আমি ট্রেনে উঠে পড়ি। ফার্স্ট ক্লাস বগি প্রায় ফাঁকা। দুটো সীট নিয়ে শোয়ার আয়োজন করে ফেলি। এক সময় ট্রেন চলতে শুরু করে।

(চার)

রাত ৩টায় ট্রেন থামে কলম্বো ফোর্ট স্টেশনে। সেখান থেকে অনেকটা পায়ে হেটে সিটি বাসস্টান্ডে আসি। গলের উদ্দেশ্যে বাস ছাড়া শুরু করেছে ভোর ৪টা থেকেই। এমনকি সিটি

বাসগুলোও চলা শুরু করেছে ভোরের আলো না ফুঁটতেই। এসি কোস্টারে টিকিট কাটলাম। ছাড়ল ভোর সাড়ে ৫টায়। সাগর ঘেঁষে মেরিন ড্রাইভ রোড ধরে গাড়ি ছুটে চলে। দু'চোখ ঘুমে ঢুলু ঢুলু। তার মাঝেও মুগ্ধ দৃষ্টি ছুটে যায় সাত সকালের নীলাভ স্নীগ্ধ সমুদ্র আর বালুকাবেলায় ঝুঁকে থাকা সারি সারি নারিকেলের বনে। সকাল ৮টার দিকে গলে নামলাম। বাসস্ট্যান্ড থেকে পায়ে হাঁটা দূরত্বে গল ফোর্ট। কী করব ভাবছি। সেই ফাঁকে একজন দাঁড়িওয়ালা টুকটুক চালক এগিয়ে এসে সালাম দিলেন। মাদরাসার কথা বলতেই খুব আগ্রহভরে বললেন, চলুন পৌঁছে দেই। দূর্গের মেইন গেট থেকে বেশ ভিতরে 'মাদরাসা বাহজাহ ইবরাহীমীয়া'র গেটে এসে নামলাম। সাদা বিল্ডিং। অনেক উঁচু ছাদ। গেটের উপর ইংরেজী ও আরবীতে মাদরাসার নাম এবং নীচে অর্ধচন্দ্রাকারে লেখা 'এ্যারাবিক কলেজ'। প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৯২ খৃঃ।

শ্রীলংকার সর্বদক্ষিণের ভূখণ্ড গল। ১৫৪১ সালে যখন শহরটি একটি ব্যস্ত নৌবন্দর ও পোতাশ্রয় ছিল, তখন এই দূর্গটি প্রথম স্থাপন করে পর্তূগীজরা। তবে পূর্ণাঙ্গ দূর্গে পরিণত হয় ডাচদের হাতে ১৬৪০ সালের দিকে। চওড়া প্রকাণ্ড বাউণ্ডারী ওয়ালে ঘেরা চতুর্দিক। সাগরের ঢেউ এসে অবিরাম আছড়ে পড়ছে দেয়ালের বাইরে প্রতিরোধক পাথরের স্তূপে। ভিতরে পরিপাটি ঝকঝকে শহর। চার্চ, মন্দির, মসজিদ-মাদরাসা, হাট-বাজার, আবাসিক ঘর-বাড়ি, মিউজিয়াম, হোটেল প্রয়োজনীয় সবই রয়েছে এই শহরে। ইউরোপীয় আদলে লালটালির দো'চালা বাংলো বাড়ি-ঘর রাস্তার দু'ধারে। প্রচুর ইউরোপীয় পর্যটক দলবেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিলক্ষণ মনে হবে এটি কোন পশ্চীমী শহর। গল শহর গড়ে উঠেছে এই দূর্গকে কেন্দ্র করে। গলে এসে কোন পর্যটকের জন্য এই দূর্গটি ভ্রমণই মোটামুটি যথেষ্ট।

ভিতরে ঢোকার পর কয়েকজন ছাত্র এগিয়ে এল। ওরা জানালো আজ শুক্রবার ছুটির দিন। মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল মৌলভী রিজভী ছাহেব গ্রামের বাড়িতে গেছেন। তবে হাউস টিউটর মাওলানা খালেদ আব্দুল কাদের (৪৫) রয়েছেন। তাঁর সাথে দেখা হ'ল। আমি বাংলাদেশী জেনে খুব খুশী হলেন। পরিচয়পর্বে জানালেন তাঁর বাড়ি জাফনায়। তবে গলের এই মাদরাসায় শিক্ষকতা করছেন প্রায় দেড় যুগ ধরে। মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীলংকার বিখ্যাত মুসলিম ব্যবসায়ী পরিবার 'মাকান-মারকার পরিবার'। কয়েক পুরুষ ধরে এই পরিবারটি ব্যবসায়িক এবং রাজনৈতিক ময়দানে শ্রীলংকান মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করছে। মাদরাসাটির সার্বিক খরচ অদ্যবধি এই পরিবারই বহন করে।

বৃটিশ আমলে ভবনটি ডাকঘর হিসাবে ব্যবহৃত হত। পরে মাকান-মারকার পরিবার এটি ক্রয় করে নেয় এবং মাদরাসায় পরিণত করে। বর্তমানে মাদরাসায় ছাত্র সংখ্যা ৫০ এবং শিক্ষক রয়েছেন ৬ জন। হিফয থেকে শুরু করে বুখারী পর্যন্ত পড়ানো হয়। অনেকটা দারসে নিযামীর নিয়মই অনুসরণ করা হয়, তবে ফিকহের ক্ষেত্রে শাফেঈ মাযহাবের কিতাব এবং আক্বীদার ক্ষেত্রে পড়ানো হয় ইবরাহীম মালেকী রচিত আশ'আরী আক্বীদার কিতাব জওহারুত তাওহীদ। হালের নবসৃষ্ট ছূফী তরীকা শাযলীয়া ফাসিয়াহ এখানে বহুলভাবে চর্চিত হয়। এই তরীকার বিশেষত্ব জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ফজর এবং মাগরিব ছালাত বাদ সমস্বরে নির্দিষ্ট তাল ও লয়ে ১২ বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়া, প্রতিদিন কাছীদা বুরদাহ পাঠ করা, আছরের পর বিশেষ যিকির-আযকার করা, প্রতি শুক্রবারে জুম'আর ছালাতের পূর্বে দাঁড়িয়ে গোল হয়ে দরূদ পাঠ করা ইত্যাদি। মাদরাসার লাইব্রেরীটি প্রাচীন গ্রন্থরাজিতে ঠাঁসা। মাদরাসায় একজন মিসরী শিক্ষক রয়েছেন। তবে ক্যান্ডিতে ছিলেন বলে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হ'ল না। মাওলানা খালেদ বললেন, শ্রীলংকার বিভিন্ন মাদরাসায় এমন আরো ৩০ জন মিসরী শিক্ষক রয়েছেন, যারা সরকারী চুক্তির মাধ্যমে এসেছেন এবং ছাত্রদের আরবী ভাষা শিক্ষা দেন।

গল শহর সম্পর্কে বললেন, এক যুগ পূর্বে গল ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট শহর। তবে এখন তা নেমে গিয়ে ৪০%-এ পরিণত হয়েছে। এর কারণ সম্ভবত এটাই যে, বাসিন্দারা অধিকাংশই রাজধানী কলম্বোমুখী হচ্ছে। শহরে বর্তমানে অর্ধশতাধিক মসজিদ এবং ৬টি মাদরাসা রয়েছে। এই মাদরাসাটি শ্রীলংকার প্রাচীনতম মাদরাসার একটি। মাতারা যেলার ওয়ালিগামাতে অবস্থিত 'মাদরাসাতুল বারী'ই কেবল এর পূর্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

আলাপের শেষ পর্যায়ে সালাফীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সালাফীদেরকে এখানে ওহাবী বলা হয় এবং খারাপ চোখে দেখা হয়। সালাফী আলেমদের নাম বলতে গিয়ে প্রথমেই বললেন কুরুণাগ্যালের মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীকের কথা। যিনি 'জমঈয়াতু আনছারুস সুন্নাহ'-এর প্রধান। তামিল ভাষার আহলেহাদীছ পত্রিকা 'তুলু'উল হক্বে'র একটি সংখ্যা তাঁর কাছে রয়েছে জানালেন, তবে লাইব্রেরীতে খুঁজে পেলেন না।

প্রায় দু'ঘণ্টা পর ১০টার দিকে উঠলাম। জুম'আর দিন আজ। যতদ্রুত সম্ভব কলম্বো ফিরে নেগোম্বোতে মাওলানা ইয়াহইয়া সিলমীর সাথে সাক্ষাতের পরিকল্পনা ছিল। মাদরাসাতেই চিকেন বার্গার আর চা দিয়ে সকালের নাস্তা সেরে গোসল করে নিলাম। শ্রীলংকায় একটি ব্যাপার দেখলাম, বাথরুমগুলোতে বদনার পরিবর্তে প্লাস্টিকের বালতি এবং তার মধ্যে বাটি ব্যবহার করা হয়। খুবই অসুবিধাজনক ঠেকেছে। সোহেল ভাইকে বলছিলাম আপনি আলুর ব্যবসা বাদ দিয়ে বদনার ব্যবসা ধরেন। অনেক লাভবান হবেন, আর এই জাতির জন্যও বড় উপকার হবে...হাহা। এছাড়া প্রতিটি মসজিদে ওযু করার জন্য ৩ প্রকার ব্যবস্থা। ট্যাপ থেকে দাঁড়িয়ে ও বসে এবং চৌবাচ্চা থেকে সরাসরি পানি নিয়ে। কোথাও এর ব্যত্যয় নেই।

মাওলানা খালেদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দূর্গ দেখতে বের হলাম। সাথী হ'ল মাদরাসার এক ছাত্র ক্যান্ডির বাসিন্দা

সরফরাজ। দূর্গের পিছনে বাঁধের মত উঁচু প্রাচীরের পিছনে সাগর। প্রাচীরের উপর উঠলে দূর্গের অভ্যন্তরভাগ নযরে আসে। সেখানে দাঁড়িয়ে দূর্গের একমাত্র মসজিদ 'মীরা মসজিদ' এবং লাইটহাউজ দেখলাম। দিগন্তবিস্তারী সাগরের মাঝে বড় বড় পাথরের ঢিবি। একটু পর পর বিশাল বিশাল ঢেউ এসে আঘাত হানছে সেই ঢিবির গায়ে আর বিপুল বিক্রমে ফোয়ারার মত ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। ভারী সুন্দর দৃশ্য। দূর্গের প্রাচীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে প্রধান ফটকের দিকে এগুলাম। এক জায়গায় এসে দেখি প্রাচীরের গা ঘেঁষে সমুদ্রতীরে একটি লম্বা কবর। পাকা করে বাঁধানো। তার পার্শ্বে একটি পানির কুয়া। সরফরাজ বলল, ২০০৪ সালে সুনামীর সময় এই দূর্গ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'লেও কবরটির কিছু হয়নি এমনকি কুয়াটির পানিও লবণাক্ত হয়নি। ধারণা করা হয় এটি প্রাচীনকালের কোন দ্বীনদার ব্যক্তির কবর। আল্লাহু আ'লাম। এক জায়গায় দেখা গেল এল শেপের দীর্ঘ ৪০/৫০ ফুট গভীর গর্ত। গর্তের প্লাস্টার করা দেয়াল ধীরে ধীরে সরু হয়ে নেমে গেছে নীচ পর্যন্ত। উপরে ছাদ নেই। এটা ছিল সেই কালের জেলখানা। কী পরিমাণ মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে হত বন্দীদের এই গর্তে, তা চিন্তা করে বুক হীম হয়ে আসে।

প্রধান ফটকের দুই দিকটা অনেক উঁচু। তার উপর ক্লক টাওয়ার। এখান থেকে গল শহর মোটামুটি দেখা যায়। নাক বরাবর গল ক্রিকেট স্টেডিয়াম। তার পূর্বদিকে নৌবন্দর। স্টেডিয়ামের প্রায় গায়ে এসে পোতাশ্রয়ের পানি ঠেকেছে। ঘণ্টাখানিক দূর্গের চারপাশ ঘুরে দেখার পর নীচে নেমে 'অল সেইন্টস ক্যাথেড্রাল' এবং কিছু রত্ন পাথরের (Gems) দোকান দেখে বেরিয়ে আসলাম। বিদায়ের সময় সরফরাজকে কিছু চকলেট আর আতর হাদিয়া দিলাম। বড় ভদ্র আর খেদমতগার ছেলেটি।

বাসস্টাণ্ডে এসে হাইওয়ে এক্সপ্রেস বাস পেয়ে গেলাম। বাসের যাত্রী অধিকাংশই পর্যটক। নবনির্মিত অত্যাধুনিক এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে রওনা দিল বাস। পাকিস্তানের লাহোর-পেশোয়ার মটরওয়ে'র মতই সুমসৃণ এবং প্রতিবন্ধকতাহীন রোড। ঘণ্টা দুই পর মাহারাগামা বাসস্টাণ্ডে নামলাম। তারপর লোকাল বাসে কলম্বো ফোর্ট হয়ে কিছুটা এগিয়ে মালিগাওয়াত্তা (কলম্বো-১০)। সেখান থেকে বেশ কিছুক্ষণ খুঁজতে কাঙ্ক্ষিত ২৪১/এ, শ্রী সাধার্মা মাওয়াথায় অবস্থিত 'শ্রীলংকা তাওহীদ জামা'আতে'র প্রধান কার্যালয়টি পেয়ে গেলাম। চার তলা বিল্ডিংটির ১ম তলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ২য় তলা মসজিদ এবং ৩য়/৪র্থ তলা অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ওযু করে মসজিদে যখন ঢুকলাম তখন আছরের ছালাতের সময় হয়েছে। জামা'আত শুরু হ'ল। পুরোপুরি আহলেহাদীছ তরীকায় ছালাত পড়লেন মুছল্লীরা। ছালাত পর ইমাম ছাহেবের সাথে কথা হ'ল। তিনি বললেন, আব্দুল রাযিক ভাই সাংগঠনিক প্রোগ্রামে কলম্বোর বাইরে আছেন, তবে অন্যান্য ভাইদের সাথে কথা বলতে পারেন। উপরে নিয়ে অফিসে বসালেন। একটু পর এলেন দু'জন ভাই। এই অফিসেরই স্টাফ। দু'জনের একজন হলেন তাওসীফ ভাই। বিবিএ পাশ করে এখন সংগঠনের আইটি সেক্টর দেখাশোনা করেন। তাঁর সাথে ফেসবুকে পরিচয় দীর্ঘদিনের। আজ প্রথম সরাসরি দেখা। লম্বা কুলাকুলি হ'ল। তারপর শুরু হ'ল নানা বিষয়ে আলাপ।

প্রথমতঃ স্বীকার করতে চাইলেন না যে তারা সালাফী বা আহলেহাদীছ। তাদের কথা, আমরা কেবল কুরআন ও সুন্নাহ'র অনুসারী। মৃদু তর্কের পর অবশ্য তাঁরা স্বীকার করলেন যে, আমরা যতই নিজেদেরকে সালাফী হিসাবে পরিচয় না দেই, মানুষ আমাদেরকে সালাফী হিসাবেই জানে। সুতরাং এটা নিজেকে লুকানোর একটি ব্যর্থ প্রয়াস এবং হীনমন্যতারও পরিচায়ক। শ্রীলংকা তাওহীদ জামা'আত (এসএলটিজে) সম্পর্কে জানালেন, এটি ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এটি স্বতন্ত্র সংগঠন নয়, বরং ইণ্ডিয়ার তামিলনাড়ু ভিত্তিক সংগঠন 'তাওহীদ জামা'আত' (টিএলটিজে)-এর শাখা সংগঠন হিসাবে তারা কাজ করছেন শ্রীলংকায়। মূল সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা ২০০৪ সালে এবং প্রতিষ্ঠাতা জনাব যায়নুল আবেদীন। তিনি ১৯৫৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন তামিলনাড়ুতে। লেখাপড়া দেওবন্দী মাদরাসাতে। একপর্যায়ে তিনি আল্লাহতে অবিশ্বাসী নাস্তিকে পরিণত হন। অবশেষে পুনরায় ইসলামগ্রহণ করে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া শুরু করেন এবং মানুষকে শিরক ও বিদ'আত থেকে সতর্ক করতে থাকেন। তামিলনাড়ুতে খুব অল্প সময়ে তাঁর লক্ষাধিক সমর্থক তৈরি হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংগঠন জাতীয় রাজনীতিতে সরাসরি যুক্ত না থাকলেও মুসলিমদের জন্য সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে নির্বাচনের সময় প্রেসার গ্রুপ হিসাবে কাজ করে।

তাদের মূল লক্ষ্য সমাজে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা এবং শিরক বিদূরিত করা। অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতী কাজে তারা বিশেষ জোর দেন। এছাড়া সমাজ কল্যাণমূলক ক্ষেত্রগুলোতেও তারা বিস্তৃতভাবে কাজ করেন। বিশেষত রক্তদান তাদের নিয়মিত কর্মসূচির অংশ। তামিলনাড়ু এবং শ্রীলংকাতে সর্বাধিক ব্লাড ডোনেশনের জন্য সংগঠনটি একাধিকবার জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে।

শ্রীলংকার প্রতিটি শহরে তাদের দাওয়াতী কার্যক্রম রয়েছে। সমর্থক সংখ্যা কমপক্ষে ৫০,০০০। উন্মুক্ত জলসা, টেবিল টক, অমুসলিমদের সাথে বিতর্ক, প্রেস কনফারেন্স, ইন্টারনেট প্রভৃতি মাধ্যমে তারা দাওয়াতী কাজ করে থাকেন। 'আদ-দাওয়াহ' নামে তারা তামিল ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন। প্রচার সংখ্যা ৪ হাযার। মহিলাদের মধ্যেও তাদের ব্যাপক কার্যক্রম রয়েছে। বর্তমানে শ্রীলংকায় দলটির প্রধান সমন্বয়ক হিসাবে কাজ করছেন মুহাম্মাদ রিয়ায এবং সেক্রেটারী আব্দুল রাযিক। যুবকদের মধ্যেই তাদের কার্যক্রম সর্বাধিক। বাহ্যিকভাবে সংগঠনের সদস্যদের টাখনুর উপর

কাপড় থাকলেও দাঁড়ি ছাটা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলে তাওসীফ ভাই ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চাইলেন, হাদীছের বর্ণনা মোতাবেক দাঁড়ি দীর্ঘ করে ছেড়ে দেয়া যরূরী নয়। তাদের এই ব্যাখ্যা যে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়–সেটা অল্প কথায় জানিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, আমি তো স্কলার নই, বিষয়টি আবার জেনে নেব।

তিনি আরও জানালেন, শ্রীলংকায় শী'আ, ব্রেলভী এবং ছূফীদের যথেষ্ট দৌরাত্ম রয়েছে। এরাই তাদের কার্যক্রমে সবচেয়ে বাঁধার সৃষ্টি করে থাকে। তবে শ্রীলংকার সর্বোচ্চ মুসলিম কাউন্সিল 'অল সীলন জমঈয়তুল উলামা' তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং কাউন্সিলে তাদের সদস্যপদ রয়েছে।

আহলেহাদীছ সংগঠন জমঈয়তু আনছারুস সুন্নাহের প্রধান সঊদী মাবঊছ শায়খ আবুবকর ছিদ্দীক মাদানী সম্পর্কে তিনি বললেন, শায়খ আমাদের কার্যক্রম পসন্দ করেন না। তিনি আমাদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগও করেছেন। তা সত্ত্বেও আমরা তাঁকে আগের মতই শ্রদ্ধা করি। তবে তাঁর সাথে আমাদের সাংগঠনিক সম্পর্ক নেই।

শায়খ আবুবকর ছিদ্দীক মাদানী'র ফোন নম্বর জোগাড় করা গেল না। যতদূর জানতে পারলাম তিনি বর্তমানে কুরুনাগ্যালেতেই রয়েছেন এবং 'মা'হাদ দারুত তাওহীদ'-এর মুদীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন সংগঠন 'জমঈয়তু আনছারুস সুন্নাহ-এর কার্যক্রম দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই কমবেশী রয়েছে। সংগঠনের অধীনে মোট ৬টি মাদরাসা পরিচালিত হয়, যার মধ্যে দু'টি মহিলা মাদরাসা। এছাড়া প্রতিবছরই কিছু ছাত্র সঊদী আরবের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে চান্স পায়। যাদের মাধ্যমে শ্রীলংকায় তাওহীদ ও সুন্নাতের দাওয়াত অব্যাহত রয়েছে। তাদের একজন হলেন ড. মুহাম্মাদ আমজাদ রাযেক। যিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাদীছ বিষয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেছেন।

শায়খ ইয়াহইয়া সিলমী সম্পর্কে তাওসীফ ভাই বললেন, তিনিও আমাদেরকে সালাফী দাওয়াতের শত্রু হিসাবে বিবেচনা করেন। শ্রীলংকায় তাওহীদের দাওয়াত সম্প্রসারণে তাঁর কিছু ভূমিকা থাকলেও অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং কট্টরপন্থার কারণে তিনি গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছেন। তাঁর পিতা-মাতা উভয়ই সঊদী আরবের জেদ্দায় মেডিকেল ডাক্তার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি কিশোর বয়স থেকে সঊদী শায়খদের হালাকায় বসতেন এবং দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করেন। তারপর শ্রীলংকায় ফিরে দাওয়াতের কাজ শুরু করেন। দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, তিনি মনে করেন গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় সালাফী মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত একজন যোগ্য আলেমও নেই। ডাঃ যাকির নায়িক এবং ড. বিলাল ফিলিপস্‌কে তিনি পথভ্রষ্ট, বিদ'আতী এবং কাফির সমতুল্য মনে করেন।

সব শুনে বেশ নিরাসক্ত বোধ করলাম। গল থেকে তাড়াহুড়ো করে কলম্বো আসার মূল উদ্দেশ্যই ছিল শায়খ সিলমীর সাথে সাক্ষাৎ। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে এসব শোনার পর একটু হতোদ্যম লাগছে। তবুও সিদ্ধান্ত নিলাম নেগোম্বো যাব। সরাসরি সাক্ষাৎ করেই তাঁর সম্পর্কে জানা উচিৎ। এদিকে বিকেল ৫টা বেজে গেছে। সাক্ষাৎ করে রাতে আবার কলম্বো ফিরতে পারব কি-না সেই শঙ্কা। তাওসীফ ভাইদের কাছ থেকে দ্রুত বিদায় নিয়ে বাসস্ট্যান্ড রওনা হলাম। ৬ টার পর বাস ছাড়ল। বাসে এক সঊদী প্রবাসী শ্রমজীবী ভাইয়ের দেখা পেলাম যিনি শায়খ সিলমীকে চেনেন। শায়খ সিলমী বলেছিলেন, নেগোম্বো বাসস্ট্যাণ্ডের পার্শ্বেই তাঁর মাদরাসা। কিন্তু এই ভাই বললেন, বাসস্ট্যান্ড থেকে আরও ৭/৮ কি.মি. যেতে হবে। নেগোম্বোতে নেমে শায়খ সিলমীকে কয়েকবার ফোন দিয়েও পেলাম না। রাত অনেক হয়ে যাবে চিন্তা করে অবশেষে তাঁর সাথে দেখা না করেই কলম্বো ফিরে আসলাম। সে রাতে ওয়াল্লাওয়াত্তাতে আসলাম ভাইয়ের এক বন্ধুর বাসায় রাত্রিযাপন করলাম।

পরদিন সকালে নাস্তার পর সোহেল ভাই এবং আসলাম ভাই বিদায় জানালেন। ক্ষণিকের পরিচয়ে তারা যে আন্তরিকতা এবং আতিথেয়তায় বরণ করে নিয়েছিলেন, তা ভোলার নয়। আল্লাহ তাদের মঙ্গল করুন। বাসস্ট্যান্ড থেকে শাটল বাস ধরে বিমানবন্দর পৌঁছে গেলাম ১১টার মধ্যেই। তারপর বেলা ১টার ফ্লাইটে করাচী রওয়ানা হলাম। মিহিন লংকার জানালা দিয়ে নীল সমুদ্র ঘেরা সবুজের অরণ্যে আরেকবার দৃষ্টি দিলাম সীমাহীন মুগ্ধতা নিয়ে। এডামস্ পিক দেখা হ'ল না এ যাত্রায়। তাই আপততঃ বিদায় বললাম না। কালের চক্রে জীবনের কোন বাঁকে যদি কখনও সুযোগ মেলে, তবে ইনশাআল্লাহ আবারও হয়ত আসা হবে ভারত মহাসাগরের সৌন্দর্যতীলক এই সিংহল দ্বীপে। বিদায়টা না হয় তখনই নেয়া যাবে।

লেখক : আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
এম.এস (হাদীছ), ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান

উত্তম মানুষের পরিচয়

(ক) ঐ ব্যক্তি, যার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলে তাকে ধৈর্যশীল পাবে।
(খ) যখন রাগান্বিত হয়, তখন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়।
(গ) কোন নে'মত পেলে দান করে।
(ঘ) তাকে উপঢৌকন দেয়া হলে তার চেয়ে বড় প্রতিদান দেয়।
(ঙ) অঙ্গীকার করলে পূর্ণ করে। যদিও তা বড় হয়।
(চ) যখন তার নিকট কোন অভিযোগ করা হয়, তখন তাকে অত্যন্ত রহমদিল পাওয়া যায়।

সংগঠন সংবাদ

কর্মী সম্মেলন ২০১৫

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৮ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর পশ্চিম পার্শ্বস্থ ময়দানে **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। প্রধান অতিথি মহোদয় তাঁর ভাষণে বলেন, আছহাবে কাহফের যুবকরা তাদের জীবদ্দশায় সমাজ পরিবর্তন করতে পারেনি। কিন্তু দীর্ঘ তিনশ' বছরের নিদ্রা শেষে জেগে উঠে তারা দেখতে পেয়েছিল যে, পুরা সমাজ ও রাষ্ট্র তাদেরই মত তাওহীদপন্থী হয়ে গিয়েছে। আজও জাহেলী স্রোতের উল্টা চলার মত দৃঢ়চিত্ত আল্লাহভীরু যুবশক্তির মাধ্যমেই সমাজ পরিবর্তন করা সম্ভব যদি আল্লাহ চাহেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মের নামে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ সমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে একক ইমারতের অধীনে জামা'আতবদ্ধভাবে তোমরা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ কর। তিনি তাদের প্রতি নৈতিকভাবে বলিয়ান হওয়ার জন্য নিয়মিত নফল ইবাদতসমূহ অভ্যস্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক রফীকুল ইসলাম, অধ্যাপক জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার প্রমুখ।

সম্মেলনে 'তৃণমূল পর্যায়ে জনমত গঠনে সংগঠনের ভূমিকা' বিষয়ে বক্তব্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকে পাঁচ মিনিট করে সময় পান। তাতে ১০ জন অংশগ্রহণ করেন। আব্দুর রহীম (রাজশাহী-পূর্ব যেলা সভাপতি), আশরাফুল ইসলাম (রাজশাহী-পশ্চিম যেলা সভাপতি), আবুল কালাম (জয়পুরহাট যেলা সভাপতি), আব্দুর রাযযাক (বগুড়া যেলা সভাপতি), ইয়াসিন আলী (চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা সভাপতি), সা'দ আহমাদ (মেহেরপুর যেলা সভাপতি), আসাদুল্লাহ মিলন (ঝিনাইদহ যেলা সভাপতি), তরীকুল ইসলাম (যশোর যেলা সভাপতি), মাহমূদুল হাসান (সিরাজগঞ্জ যেলা সহ-সভাপতি), তারেক হাসান (পাবনা যেলা সভাপতি), হুমায়ূন কবীর (ঢাকা যেলা সভাপতি), মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল (নারায়ণগঞ্জ যেলা সভাপতি), শিহাবুদ্দীন আহমাদ (রংপুর যেলা সভাপতি), হাতেম বিন পারভেজ (গাযীপুর যেলা সভাপতি), আহমাদুল্লাহ (কুমিল্লা যেলা সাধারণ সম্পাদক), হারূনুর রশীদ (কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, ঝিনাইদহ)।

উক্ত আলোচকদের মধ্যে ১ম, ২য়, ও ৩য় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, রংপুর যেলা সভাপতি শিহাবুদ্দীন আহমাদ, গাযীপুর যেলা সভাপতি হাতেম বিন পারভেজ। এছাড়া 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের পরামর্শের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ যেলা, শ্রেষ্ঠ সভাপতি, শ্রেষ্ঠ সাধারণ সম্পাদক এবং শ্রেষ্ঠ সংগঠকের নাম ঘোষণা করা হয়। তারা হ'লেন শ্রেষ্ঠ যেলা জয়পুরহাট, শ্রেষ্ঠ সভাপতি শামীম আহমাদ (সিরাজগঞ্জ), শ্রেষ্ঠ সাধারণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ (কুমিল্লা), শ্রেষ্ঠ সংগঠক মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল (নারায়ণগঞ্জ)। অতঃপর তাদের সবাইকে পুরস্কৃত করা হয়।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম। বিভিন্ন পর্যায়ে কুরআন তেলাওয়াত করেন 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক এহসান এলাহী যহীর, 'যুবসংঘ'-এর কর্মী হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, মারকাযের কুল্লিয়া ১ম বর্ষের ছাত্র হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন যশোর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি আব্দুস সালাম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ জামীলুর রহমান (কুমিল্লা)।

যেলা সংবাদ : গাইবান্ধা পশ্চিম

খামার, গাইবান্ধা ২ জানুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ যোহর হাজীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সুজা মিঁয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুছতাফীযুর রহমান।

পুনতাইড়, নাকাইহাট, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ৮ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ পুনতাইড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নাকাইহাট এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুছ ছবুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন।

খামার, হাজিপাড়া, গাইবান্ধা ২৯ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ খামার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গাইবান্ধা পূর্ব 'আন্দোলন'-এর

সহ-সভাপতি আব্দুর নূর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধ পশ্চিম 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা পূর্ব যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক ইউনুছ আলী ও অর্থ সম্পাদক হুমায়ুন কাবীর প্রমুখ।

যেলা সংবাদ : যশোর

মনোহরপুর, মনিরামপুর, যশোর ২২ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'যুবসংঘ'-এর মনোহরপুর শাখার উদ্যোগে **'কৃতি ছাত্র-ছাত্রী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ২০১৬'** অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আজহার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলান বযলুর রশীদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি তরীকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, অর্থ সম্পাদক আনোয়ার জাহিদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আব্দুল গাফফার, মনিরামপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি ও বর্তমানে যেলা 'সোনামণি'-এর পরিচালক আশরাফুল আলম।

যশোর টাউন ২৩ জানুয়ারী, শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যশোর টাউন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আন্দোলন' সদর উপযেলার উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফার বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও বর্তমানে যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আকবার হোসাইন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বযলুর রশীদ, কেশপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুত্তালিব বিন ঈমান, মাওলানা আব্দুর রশীদ (লেবুতলা), মাওলানা আলী আকবর চৌগাছা প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি হাফেয তরিকুল ইসলাম। জাগরণী পরিবেশন করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আব্দুস সালাম।

উপযেলা সংবাদ : জয়পুরহাট

বুড়াইল, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট ৮ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ বুড়াইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ক্ষেতলাল উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুস্তাক আহমাদ সারোয়ার, প্রচার সম্পাদক ফিরোজ হোসেন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুবকর ছিদ্দীক ও 'সোনামণি' যেলা সহ-পরিচালক শাহ আলম প্রমুখ।

গভরপুর, জামালপুর, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট ১৫ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ গভরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গভরপুর শাখা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আক্কেলপুর উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর উপদেষ্টা মাহমূদুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি উলফত মোল্লা, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুযাম্মেল হক ও যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুনায়েম হোসেন।

পলিকাদোয়া, জয়পুরহাট ২২ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ পলিকাদোয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পলিকাদোয়া শাখার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাসঊদ রানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রধান মুহাম্মাদ আবুল কালাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক্ব, প্রচার সম্পাদক ফিরোজ হোসেন ও 'সোনামণি' যেলা সহ-পরিচালক শাহ আলম প্রমুখ।

জীবনপুর, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট ২২ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ জীবনপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পাঁচবিবি উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রধান মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আব্দুন নূর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুস্তাক আহমাদ সারোয়ার, অর্থ সম্পাদক আব্দুর রহমান, যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুনায়েম হোসেন, সহ-পরিচালক শাহ-আলম ও শামীম হোসেন।

কালাই, জয়পুরহাট ২৯ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ কালাই উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে কালাই জুম্মাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক মুস্তাক আহমাদ সারোয়ার, প্রচার সম্পাদক ফিরোজ আহমাদ, সোনামণি পরিচালক মুনায়েম হোসেন।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

খারেজী মতবাদ : পর্ব-২

১. বানী ইসরাঈলরা কয়টি দলে বিভক্ত ছিল?
উত্তর : ৭১ টি দলে *(আল-আহাদীছুল মুখতারাহ হা/২৪৯৯)*।
২. রাসূল (ছাঃ)-এর উম্মত কয়টি দলে বিভক্ত হয়েছিল?
উত্তর : ৭৩ দলে *(ঐ)*।
৩. কোন্ দলটি ব্যতীত সব জাহান্নামে যাবে?
উত্তর : ঐক্যবদ্ধ দল ব্যতীত *(ঐ)*।
৪. আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর সময়ে কি খারেজীরা আত্মপ্রকাশ করেছিল?
উত্তর : না।
৫. ইসলাম বিরোধী যাবতীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রথম খড়্গহস্ত কে ছিলেন?
উত্তর : আবুবকর (রাঃ)।
৬. অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুদ্রকঠোর আপোসহীন কে ছিলেন?
উত্তর : ওমর (রাঃ)।
৭. চরমপন্থীরা কার খেলাফতকালে মাথা চাড়া দিতে পারেনি?
উত্তর : ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে।
৮. আবু লু'লু কে?
উত্তর : খলীফা ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালের জনৈক অগ্নি উপাসক।
৯. আবু লু'লু কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করে?
উত্তর : বাহ্যিকভাবে।
১০. ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে কে গোপনে মদীনায় প্রবেশ করে?
উত্তর : আবু লু'লু।
১১. ওমর (রাঃ) ইমাম হয়ে ফজরের ছালাত আদায় করার সময় কে গোপনে ছদ্মবেশ নিয়ে প্রথম কাতারে অবস্থান করে?
উত্তর : আবু লু'লু।
১২. আবু লু'লু কার খেলাফতকালে গোপনে মদিনায় প্রবেশ করে?
উত্তর : ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে।
১৩. আবু লু'লু কোন্ ধরণের তরবারী দ্বারা ওমর (রাঃ)-কে আঘাত করে?
উত্তর : তীক্ষ্ণ তরবারী দ্বারা।
১৪. আবু লুলু ওমর (রাঃ)-এর শরীরে কোন্ জায়গায় আঘাত করে?
উত্তর : কোমরে।
১৫. আবু লু'লু তীক্ষ্ণ তরবারী দ্বারা ওমর (রাঃ)-কে কয়বার আঘাত করে?
উত্তর : তিন অথবা ছয়বার।
১৬. ওমর (রাঃ) উক্ত আঘাতের কয়দিন পর শাহাদত বরণ করেন?
উত্তর : তিন দিন পর।
১৭. ওমর (রাঃ) কার আঘাতে শাহাদত বরণ করেণ?
উত্তর : শয়তান আবু লু'লুর আঘাতে।
১৮. ওমর (রাঃ) কত হিজরীর কত তারিখে আঘাতপ্রাপ্ত হন?
উত্তর : ২৩ হিজরীর ২৬ যিলহজ্জ তারিখে।
১৯. কাকে হত্যার পর চরমপন্থীদের পুনরুত্থান ঘটে?
উত্তর : ওমর (রাঃ)-কে হত্যার পর *(আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/১৪১-১৪২ পৃঃ)*।
২০. আবু লু'লু সেই দিন আরো কয়জনকে আঘাত করেছিল?
উত্তর : ১৩ জনকে *(ঐ)*।
২১. সেই দিন কয়জন ছাহাবী শাহাদত বরণ করেন?
উত্তর : ৯ জন *(ঐ)*।
২২. ঐ ঘাতক নিজেই নিজেকে কি জন্য হত্যা করে?
উত্তর : পালিয়ে যেতে না পেরে *(ঐ)*।
২৩. আবু লু'লু নিজেকে কি দ্বারা আত্মহত্যা করে?
উত্তর : নিজের অস্ত্র দ্বারা *(ঐ)*।
২৪. চরমপন্থীরা কি কারণে এবং কখন পুনরায় সংগঠিত হতে থাকে?
উত্তর : ওমর (রাঃ)-কে হত্যার পর; মুসলিম শক্তিকে দুর্বল মনে করে *(আল-বিদায়হা ওয়ান নিহায়াহ ৭/১৭৪ ও ১৭৮ পৃঃ)*।
২৫. চরমপন্থীরা কোন্ সময়ে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ঘটায়?
উত্তর : ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে *(ঐ)*।
২৬. ওছমান (রাঃ)-এর সময়ে তাদের হিংস্রতার কারণ কি ছিল?
উত্তর : ওছমান (রাঃ)-এর নম্রতা ও সরলতা *(ঐ)*।
২৭. আব্দুল্লাহ বিন সাবা কে ছিল?
উত্তর : এক জঘন্য ইহুদী *(ঐ)*।
২৮. আব্দুল্লাহ বিন সাবা কিভাবে মুসলিম সমাজে স্থান করে নেয়?
উত্তর : বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে গুপ্তচর হিসাবে *(ঐ)*।
২৯. ওছমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে কে, কাদেরকে প্ররোচিত করে?
উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন সাবা; চরমপন্থীদেরকে *(ঐ)*।
৩০. ওছমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে কয়টি অভিযোগ উত্থাপিত হয়?
উত্তর : চারটি *(ঐ)*।
৩১. ওছমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ কি ছিল?
উত্তর : মুহাম্মাদ (ছাঃ) যেমন নবীদের ধারাবাহিকতার সমাপ্তকারী, তেমনি আলী (রাঃ)ও সর্বশেষ অছি। সুতরাং ওছমানের চেয়ে আলীই খলীফা হওয়ার জন্য বেশী হক্বদার *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/১৭৪ ও ১৭৮ পৃঃ)*।
৩২. ওছমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ কি ছিল?
উত্তর : পবিত্র কুরআনের পরিত্যক্ত ছহীফা সমূহ পুড়িয়ে দেয়া *(ঐ)*।
৩৩. ওছমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ কি ছিল?
উত্তর : মর্যাদাশীল জ্ঞানী ছাহাবীগণকে বাদ দিয়ে নিজের আত্মীয়-স্বজনকে রাষ্ট্রের উচ্চপদে চাকরী দেয়া *(ঐ)*।
৩৪. ওছমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে চতুর্থ অভিযোগ কি ছিল?
উত্তর : স্বজনপ্রীতি করে নিকটাত্মীয়দেরকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অধিক সম্পদ প্রদান করা ইত্যাদি *(ঐ)*।